Issue cover not available

Vol. 12 | No. 2 | 1968

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বিংশশতাব্দীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা

Volume	12
Issue	2
Year	1968
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুজাফফর আহমদ চৌধুরী
Published online	December 16, 1968
DOI	10.62328/sp.v12i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v12i2.3
Pages	120-160
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বিংশশতাব্দীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা

মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদ চৌধুরী

চিন্তাধারার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে যাহারা ইহার ইতিহাস রচনা করেন, তাঁহারা বিশেষ কোন ছাঁচে না ফেলিয়া তাঁহাদের রচনার উপকরণকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন না। অবশ্য এই ব্যাপারে তাঁহারা বিবেকসম্পন্ন ও সত্যলব্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে অনুভব করেন। অবশ্য এই মন্তব্য মানব-সভ্যতার ইতিহাস বিবর্তনে নিহিত অমোঘ রীতি ও অধিবিশ্বানুগ নীতিসংক্রান্ত যে-কোন ধরণের জনপ্রিয় হেগেলীয় মতবাদের প্রতি আনুগত্য প্রসূত নয়। এই ধরণের মতবাদের প্রভাব বর্তমানে বিশেষভাবে অনুভূত নয়। এই মতবাদ অনুসারে সমাজ-ব্যবস্থা, ব্যক্তি, বস্তু ও ঘটনাপ্রবাহের গুণাবলী ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব। যে কোন ধরণের মৌলিক মননরীতি বা নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করাই ইহার মূলকথা। এবং এই নীতি হইবে অতীত ও ভবিষ্যতের অভ্রান্ত পথনির্দেশক। ইহা যেন এক যাদু যাহার ফলে অন্তর্নিহিত, অমোঘ ও নির্ভুল ঐতিহাসিক বিধি ও রীতি মানুষের নিকট উদ্ঘাটিত হইবে। যাহারা শুধুমাত্র ঘটনাপ্রবাহ লিপিবদ্ধ করেন, তাহাদের চোখে ইহা ধরা পড়িবে না, সম্যকরূপে বুঝিতে পারিলে এই নীতি ঐতিহাসিককে দিবে এক অপূর্ব ধরণের নিশ্চয়তা — কি ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তা নয় শুধু বরং এইভাবে না ঘটিয়া ইহার গত্যন্তর ছিল না তাহাও জানাইয়া দিবে। এইভাবে তিনি নিশ্চিতজ্ঞানের সন্ধান পাইবেন। যিনি পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করেন, যিনি অগণিত তথ্য সংগ্রহ করেন, তথ্য ব্যতীত আর কিছু বুঝেন না, কঠোর পরিশ্রম করিয়া নানা ধরণের উপকরণ সংগ্রহ করেন, বহুকষ্টে সংগৃহীত তথ্য প্রমাণ সম্পর্কেও অনিশ্চয়তা পোষণ করেন, যিনি সব সময়ে ভুল করেন, ও আবার পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করেন সেই অভিজ্ঞতাবাদী এই ধরণের জ্ঞান অর্জনের আশা পোষণ করিতে পারেন না। ঐতিহাসিক বিধিসংক্রান্ত এই ধরণের মতবাদকে অধিবিশ্বক প্রহেলিকা বা রহস্য মনে করিয়া কঠোর সমালোচনা করা হয়, হয়ত বা

এই সমালোচনা ন্যায্য। কিন্তু তথ্যসংক্রান্ত মতবাদও — অর্থাৎ তথ্য-তত্ত্ব ব্যতীত অন্য কিছুই নয়. — এই মতবাদ, যাহা মানুষের সৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থার ব্যখ্যায় কলুষিত হয় নাই — সমভাবে কাল্পনিক। অনুধাবন করা, হৃদয়ঙ্গম করা, তুলনামূলক পর্যা- লোচনা করা, শ্রেণীবিন্যাস করা এবং কম বা বেশী জটিল ছাঁচে নিরীক্ষণ করা — এই ধরণের মননশীলতাকে একটা 'বিশেষ ধরণের চিন্তা' না বলিয়া বরং যথার্থ চিন্তা (Thought) বলা যাইতে পারে।

ঐতিহাসিকগণ নিজেদের রচনার বিষয়বস্তু সঙ্কলন করেন, পরীক্ষানিরীক্ষা করেন, তুলনামূলক ভাবে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেন, এবং একটা বিশেষ প্রসঙ্গ ও পদ্ধতিতে তাহা সন্নিবিষ্টকরেন। এই কাজটা তাঁহারা অংশত নিজেদের পছন্দমত এবং অংশত তাঁহাদের পার্থিব ও সামাজিক পরিবেশ বা উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবান্বিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া করিয়া থাকেন। এই জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করা হয় না। এবং অভিযোগ করা চলেও না। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অত্যুক্তি, বিকৃতি সাধন, অজ্ঞতা, পক্ষপাতিত্ব ও তথ্যবিচ্যুতির অভিযোগ আনীত হয় তখনই, যখন দেখা যায়, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত তাঁহাদের সমকালীন সমাজে স্বীকৃত ও গৃহীত সত্য উদ্ঘাটন ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি হইতে অনেকখানি দূরে সরিয়া গিয়াছে। প্রচলিত পদ্ধতি ও মননরীতি একটা বিশেষ সময়ে ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে প্রচলিত সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির রূপায়ণ বা প্রতিচ্ছবি। উন্নত, মার্জিত ও সভ্য সমাজে এই দৃষ্টিভঙ্গি যে অতীব তীক্ষ্ণ ও উচ্চাঙ্গের হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে আনুষঙ্গিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি স্বীকৃত হইলেও তাহা ইহার কোন বিশেষ অংশ নয়। যখন অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব বা উদ্ভট-কল্পনা, বা প্রমাণ সংক্রান্ত সীমিত বিচারশক্তি, বা বিভিন্ন ঘটনার যোগসূত্র সম্বন্ধীয় সীমাবদ্ধ অনুভূতি বা ধারণার জন্য কোন লেখকের সমালোচনা করা হয়, তখন সেইসব সমালোচনা সত্য বা তথ্যসংক্রান্ত কঠোরতাও (তথ্যসংক্রান্ত ত্রুটিহীনতা) অতীতকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উদ্ঘাটিত করার কোন চিরস্থায়ী, নির্দিষ্ট ও পূর্ণ পদ্ধতির সুনিশ্চিত মানদণ্ডের সন্ধান দেয় না। কারণ সর্বশেষ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে যুদ্ধবিহীন কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারণার বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনার কোন মানে হয় না। এই সব সমালোচনার ভিত্তি হইতেছে বিশুদ্ধতা, যথার্থতা এবং বস্তুনিষ্ঠ সূক্ষ্ম ধারণা ও তথ্যের প্রতি চরম আনুগত্য। এই সব ধারণা কোন এক বিশেষ সমাজে ও বিশেষ সময়ের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যেই সীমিত। বিগত শতাব্দীতে ইতিহাস রচনায় যে বিরাট রোমান্টিক বিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে ব্যক্তি কেন্দ্রিক সফলতা ও কৃতিত্বের উপর সম্পূর্ণ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই, বরং সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপত্তি ও

প্রভাবের উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে তথ্যের প্রতি আনুগত্যের গুরুত্ব পরিবর্তিত হইবার কারণ ঘটে নাই। যেমন অতীতের সরকারী ও বেসরকারী আইন, বা গবর্ণমেণ্ট, বা সাহিত্য কিংবা সমাজ মনের ক্রমবিকাশের বিবরণ, আল্সী-বিয়ার্ড বা মার্কাস অরিলিয়াস বা ক্যালভীন বা চতুর্দশ লুইয়ের কর্ম ও ভাগ্যের আগেকার ইতিহাস অপেক্ষা নতুন ধরণের ইতিহাস অবশ্যম্ভাবী হলে কম বা বেশী যথার্থ বা বস্তুনিষ্ঠ, এমন কথা বলা চলে না। যেই অর্থে থ্যুকিভাইডীস, বা ট্যাসীটাস, বা ভল্টেয়ার আত্মিক, অস্পষ্ট বা কাল্পনিক নন ঠিক সেই অর্থেই র‍্যাঙ্কী, বা স্যাভীনি, বা মীছেটও আত্মিক বা কাল্পনিক নন। নূতন ইতিহাস রচিত হইয়াছে নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে। নূতন ইতিহাসে বিভিন্ন ধরণের তথ্য সন্নিবেশিত হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল, যদিও বিভিন্ন তথ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বিভিন্ন ধরণের নূতন নূতন জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। এবং সেই সব প্রশ্নে পরিবর্তিত স্বার্থ ও রুচির পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। নিয়মকানুন ও পদ্ধতির ধরণ ও আকার পরিবর্তিত হইয়াছে। এবং নূতন নূতন নিয়মকানুন ও পদ্ধতির প্রচলন হইয়াছে। সাক্ষ্য-প্রমাণ, তথ্যের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কিত পরিবর্তিত সূত্রের প্রতিচ্ছবিও পাওয়া যায় তাঁহাদের ধারণায় ও ব্যবহৃত পরিভাষায়। বিজ্ঞান ধর্মী ঐতিহাসিকগণ ঘটনাপঞ্জীর রচয়িতাদের যে কঠোর ও বিরূপ সমালোচনা করেন সেই সমালোচনায় পূর্ববর্তী কালের লেখকদের লেখায় ও পরবর্তী কালের বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে বিঘোষিত অনৈক্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সব অসংগতির মূলে রহিয়াছে মানুষের প্রগতির ক্রমবিকাশের দান ও অতীতকে বিচারের মানদণ্ড সম্পর্কে পরিবর্তিত ধারণা। এক কথায়, ধর্মতাত্ত্বিক, যান্ত্রিক, জৈবিক ও মনঃস্তাত্ত্বিক আদর্শে শিল্পীসুলভ বিরাট পরিবর্তন আসিয়াছে এবং ইহা প্রতিফলিত হইয়াছে নূতন নূতন অনুসন্ধিৎসার বিভিন্ন ও বিচিত্র ক্ষেত্রে যেমন নূতন নূতন জিজ্ঞাসাবাদে ও নবনিয়োজিত পদ্ধতিতে। ইহার ফলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাহা বিগত ও অপ্রচলিত অভিমত অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন ধরণের আদর্শ ও মানদণ্ডের এই রূপান্তরের ইতিহাসই বহুলপরিমাণে মানুষের চিন্তাধারার ইতিহাস। আর্থিক বা মার্ক্সীয় পদ্ধতিতে ইতিহাসের বিষয়-বস্তুর অনুসন্ধান রীতি প্রসঙ্গের মূলে রহিয়াছে বিশেষ ধরণের প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রভাব বা বিশেষ ধরণের সুরুচিপূর্ণ কলাকৌশলের প্রয়োগ। জীববিদ্যা ও সংগীত-শাস্ত্রের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বহুলপরিমাণে বাড়িয়াছে, ইহাতে বিবিধ ধরণের যে সব রূপক বা উপমার উদ্ভব হইয়াছে, ঊনবিংশশতাব্দীর ইতিহাস রচনায় তাহা

এই সমালোচনা ন্যায্য। কিন্তু তথ্যসংক্রান্ত মতবাদও — অর্থাৎ তথ্য-তত্ত্ব ব্যতীত অন্য কিছুই নয়. — এই মতবাদ, যাহা মানুষের সৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থার ব্যখ্যায় কলুষিত হয় নাই — সমভাবে কাল্পনিক। অনুধাবন করা, হৃদয়ঙ্গম করা, তুলনামূলক পর্যালোচনা করা, শ্রেণীবিন্যাস করা এবং কম বা বেশী জটিল ছাঁচে নিরীক্ষণ করা — এই ধরণের মননশীলতাকে একটা 'বিশেষ ধরণের চিন্তা' না বলিয়া বরং যথার্থ চিন্তা (Thought) বলা যাইতে পারে।

ঐতিহাসিকগণ নিজেদের রচনার বিষয়বস্তু সঙ্কলন করেন, পরীক্ষানিরীক্ষা করেন, তুলনামূলক ভাবে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেন, এবং একটা বিশেষ প্রসঙ্গ ও পদ্ধতিতে তাহা সন্নিবিষ্টকরেন। এই কাজটা তাঁহারা অংশত নিজেদের পছন্দমত এবং অংশত তাঁহাদের পার্থিব ও সামাজিক পরিবেশ বা উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবান্বিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া করিয়া থাকেন। এই জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করা হয় না। এবং অভিযোগ করা চলেও না। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অত্যুক্তি, বিকৃতি সাধন, অজ্ঞতা, পক্ষপাতিত্ব ও তথ্যবিচ্যুতির অভিযোগ আনীত হয় তখনই, যখন দেখা যায়, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত তাঁহাদের সমকালীন সমাজে স্বীকৃত ও গৃহীত সত্য উদ্ঘাটন ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি হইতে অনেকখানি দূরে সরিয়া গিয়াছে। প্রচলিত পদ্ধতি ও মননরীতি একটা বিশেষ সময়ে ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে প্রচলিত সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির রূপায়ণ বা প্রতিচ্ছবি। উন্নত, মার্জিত ও সভ্য সমাজে এই দৃষ্টিভঙ্গি যে অতীব তীক্ষ্ণ ও উচ্চাঙ্গের হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে আনুষঙ্গিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি স্বীকৃত হইলেও তাহা ইহার কোন বিশেষ অংশ নয়। যখন অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব বা উদ্ভট-কল্পনা, বা প্রমাণ সংক্রান্ত সীমিত বিচারশক্তি, বা বিভিন্ন ঘটনার যোগসূত্র সম্বন্ধীয় সীমাবদ্ধ অনুভূতি বা ধারণার জন্য কোন লেখকের সমালোচনা করা হয়, তখন সেইসব সমালোচনা সত্য বা তথ্যসংক্রান্ত কঠোরতাও (তথ্যসংক্রান্ত ত্রুটিহীনতা) অতীতকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উদ্ঘাটিত করার কোন চিরস্থায়ী, নির্দিষ্ট ও পূর্ণ পদ্ধতির সুনিশ্চিত মানদণ্ডের সন্ধান দেয় না। কারণ সর্বশেষ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে যুদ্ধবিহীন কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারণার বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনার কোন মানে হয় না। এই সব সমালোচনার ভিত্তি হইতেছে বিশুদ্ধতা, যথার্থতা এবং বস্তুনিষ্ঠ সূক্ষ্ম ধারণা ও তথ্যের প্রতি চরম আনুগত্য। এই সব ধারণা কোন এক বিশেষ সমাজে ও বিশেষ সময়ের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যেই সীমিত। বিগত শতাব্দীতে ইতিহাস রচনায় যে বিরাট রোমান্টিক বিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে ব্যক্তি কেন্দ্রিক সফলতা ও কৃতিত্বের উপর সম্পূর্ণ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই, বরং সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপত্তি ও

প্রভাবের উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে তথ্যের প্রতি আনুগত্যের গুরুত্ব পরিবর্তিত হইবার কারণ ঘটে নাই। যেমন অতীতের সরকারী ও বেসরকারী আইন, বা গবর্ণমেণ্ট, বা সাহিত্য কিংবা সমাজ মনের ক্রমবিকাশের বিবরণ, আল্সীবিয়ার্ড বা মার্কাস অরিলিয়াস বা ক্যালভীন বা চতুর্দশ লুইয়ের কর্ম ও ভাগ্যের আগেকার ইতিহাস অপেক্ষা নতুন ধরণের ইতিহাস অবশ্যম্ভাবী হলে কম বা বেশী যথার্থ বা বস্তুনিষ্ঠ, এমন কথা বলা চলে না। যেই অর্থে থ্যুকিভাইডীস, বা ট্যাসীটাস, বা ভল্টেয়ার আত্মিক, অস্পষ্ট বা কাল্পনিক নন ঠিক সেই অর্থেই র‍্যাঙ্কী, বা স্থাভীনি, বা মীছেটও আত্মিক বা কাল্পনিক নন। নূতন ইতিহাস রচিত হইয়াছে নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে। নূতন ইতিহাসে বিভিন্ন ধরণের তথ্য সন্নিবেশিত হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল, যদিও বিভিন্ন তথ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বিভিন্ন ধরণের নূতন নূতন জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। এবং সেই সব প্রশ্নে পরিবর্তিত স্বার্থ ও রুচির পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। নিয়মকানুন ও পদ্ধতির ধরণ ও আকার পরিবর্তিত হইয়াছে। এবং নূতন নূতন নিয়মকানুন ও পদ্ধতির প্রচলন হইয়াছে। সাক্ষ্য-প্রমাণ, তথ্যের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কিত পরিবর্তিত সূত্রের প্রতিচ্ছবিও পাওয়া যায় তাঁহাদের ধারণায় ও ব্যবহৃত পরিভাষায়। বিজ্ঞান ধর্মী ঐতিহাসিকগণ ঘটনাপঞ্জীর রচয়িতাদের যে কঠোর ও বিরূপ সমালোচনা করেন সেই সমালোচনায় পূর্ববর্তী কালের লেখকদের লেখায় ও পরবর্তী কালের বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে বিঘোষিত অনৈক্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সব অসংগতির মূলে রহিয়াছে মানুষের প্রগতির ক্রমবিকাশের দান ও অতীতকে বিচারের মানদণ্ড সম্পর্কে পরিবর্তিত ধারণা। এক কথায়, ধর্মতাত্ত্বিক, যান্ত্রিক, জৈবিক ও মনঃস্তাত্ত্বিক আদর্শে শিল্পীসুলভ বিরাট পরিবর্তন আসিয়াছে এবং ইহা প্রতিফলিত হইয়াছে নূতন নূতন অনুসন্ধিৎসার বিভিন্ন ও বিচিত্র ক্ষেত্রে যেমন নূতন নূতন জিজ্ঞাসাবাদে ও নবনিয়োজিত পদ্ধতিতে। ইহার ফলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাহা বিগত ও অপ্রচলিত অভিমত অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন ধরণের আদর্শ ও মানদণ্ডের এই রূপান্তরের ইতিহাসই বহুলপরিমাণে মানুষের চিন্তাধারার ইতিহাস। আর্থিক বা মার্ক্সীয় পদ্ধতিতে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর অনুসন্ধান রীতি প্রসঙ্গের মূলে রহিয়াছে বিশেষ ধরণের প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রভাব বা বিশেষ ধরণের সুরুচিপূর্ণ কলাকৌশলের প্রয়োগ। জীববিদ্যা ও সংগীতশাস্ত্রের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বহুলপরিমাণে বাড়িয়াছে, ইহাতে বিবিধ ধরণের যে সব রূপক বা উপমার উদ্ভব হইয়াছে, ঊনবিংশশতাব্দীর ইতিহাস রচনায় তাহা

আর একটি মূলসূত্র হইতেছে — সে-সমস্যার যুক্তিসংগত কোন সমাধান নাই এবং চিন্তা যুক্তিতর্ক ও বিচারবুদ্ধি ছাড়া অন্য উপায়ে সমস্যা সমূহের সমাধান করিতে হইবে। এবং সমস্যা সমূহকে সমূলে উৎপাটিত করিলেই তাহাদের সমাধান হইবে। পুরাতন ঐতিহ্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে শিক্ষা ও অজ্ঞতা, যুক্তিবিচার-বুদ্ধি ও গোঁড়ামী কুসংস্কার, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মধ্যে চিরন্তন সংগ্রামই ইতিহাসের বিষয়বস্তু। অন্য কথায় বলা যায় যে আত্মিকবাদ ও অভিজ্ঞাবাদ, স্বজ্ঞা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধীয় মতবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যে চলিতেছে অন্তহীন সংগ্রাম। এই ধরণের পরস্পর বিরোধী ভাবধারার বিচিত্র বিন্যাস ও বুর্জোয়া সভ্যতার বিরোধী শক্তিসমূহের মধ্যে সংঘাতই হইতেছে বহুলপরিমাণে বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক ভাবধারার ইতিহাস।

৩

বিংশশতাব্দীর রাজনীতি ও চিন্তাধারার গতিবিধি সাধারণ ভাবে আলোচনা করিলে মনে হয় যে বর্তমান সময়ের প্রতিটি ভাবধারা ও আন্দোলনই ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত ধারা ও প্রবণতার স্বাভাবিক বিকাশ এবং সেই হিসাবেই ইহা পরিষ্কার ভাবে বুঝা সহজ। ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বেলায়ও ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া মনে হয়। হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বিচারালয়, জাতিসঙ্ঘ (League of Nations), যুদ্ধোত্তর সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ (U N), প্রাকযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর অসংখ্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরিত বিভিন্ন সামরিক চুক্তি প্রভৃতি সব কিছুর উৎস হইতেছে উদার-নৈতিক আন্তর্জাতিকতাবাদ, এবং ইহাই ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বপ্রকার প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও কর্মের প্রধান উপাদান। ইউরোপীয় রাজনৈতিক উদারনীতিবাদের মহান প্রতিষ্ঠাতাদের (কনর্ডোরসেট ও হবেসিয়াস) ভাষা ও বক্তব্য এবং উড্র উইলসন বা টমাস ম্যাসারিকের বক্তব্য ও ভাষা হইতে এই গুলির মূলকথা বা দৃষ্টিভঙ্গি তেমন স্বতন্ত্র নয়। ইউরোপীয় উদারনীতিবাদ (European Liberalism) সুসংগত অন্দোলনের আবরণেই সুধীসমাজে পরিচিত। গত তিনশত বৎসরেও এই আন্দোলনের তেমন কোন পরিবর্তন হয় নাই। এই আন্দোলনের মূলে রহিয়াছে বুদ্ধিবাদ। লক্, গ্রোসীয়াস, এবং স্পীনোঁজা এই নীতির গোড়া পত্তন করেন। ইর্যাজমাস ও মন্‌টেইনী, (ইটালী রেঁনেসায়) স্যানেকা ও গ্রীক চিন্তানায়কদের লেখায় এই

মতবাদের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এই মতবাদ অনুসারে প্রত্যেক প্রশ্নের একটা যুক্তিসংগত উত্তর আছে। সর্বত্র ও সকল অবস্থায় মানুষ নীতিগতভাবে (অবশ্য যদি চেষ্টা করে) তাহার বিভিন্ন সমস্যার যুক্তিসংগত সমাধান খুঁজিয়া পাইবার সামর্থ্য রাখে। যুক্তিসংগত বলিয়াই এই সব সমাধান সমূহের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের কোন কারণ নাই, এবং ইহার পরিণতি হয় এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থায় যেখানে সত্যের বিজয় অনিবার্য। এই ব্যবস্থায় থাকিবে স্বাধীনতা, শান্তি ও সকলের জন্য অব্যাহত আত্ম-বিকাশের অফুরন্ত সুযোগসুবিধা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইতিহাস সম্পর্কে যে চেতনার উদ্ভব হয় তাহার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পরিকল্পিত এই আড়ম্বরহীন বা ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদের সহজ ও কঠোর রূপের কিছুটা পরিবর্তন হয়। তখন বুঝা গিয়াছিল যে মানুষের প্রগতির পেছনে রহিয়াছে বহুবিধ জটিল কারণ, কিন্তু যুক্তিবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের গোড়ার দিকে ইহা সঠিকভাবে কল্পনা করা যায় নাই এবং শিক্ষা ও যুক্তিবাদ সম্পর্কীয় প্রচার-কার্য সব সময়ে ও সব ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। বিশেষ বিশেষ কারণ ও ঘটনা প্রবাহের প্রভাবে মানব সমাজ ও সম্প্রদায়ের আকৃতি ও রূপ ইতিহাসের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার মূলে রহিয়াছে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক অবস্থা ও কারন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এইসব কারণ অতীব ছলনাময়ী ও আবেগময়ী এবং ইহাদের সঠিক স্বরূপ নির্ণয় করা খুবই দুরূহ কাজ। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কৃতি সম্পর্কীয় ঘটনাপ্রবাহ ও প্রভাব কাজ করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই সব কারণ ও ঘটনা প্রবাহের প্রভাবের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরেপিত হইয়াছিল। কিন্তু ডিডারো ও বেথামের পরিকল্পনায় ইহাদের গুরুত্ব তেমন স্বীকৃতি লাভ করে নাই। শিক্ষা ও সমাজিক অন্যান্য কাজ এইভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যার ফলে মানুষের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা মেটানো সম্ভবপর হয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাই মানুষ ও মানুষের প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দিষ্ট ও প্রয়োজনীয় ছাঁচে গড়িয়া তোলার পদ্ধতি কে কিছুটা দুরূহ করিয়াছিল। আগেকার দিনে এই বিষয়ে মানুষ বিশেষ আশাবাদী ছিল।

তথাপি মৌলিক কর্মসূচী বিভিন্ন প্রকারে তার সার্বিক প্রভাব বিস্তার করিয়াই চলিয়াছে। দক্ষিণপন্থীদের বেলায়ও যেমন, বামপন্থীদের বেলায়ও ইহা সমানভাবে প্রযোজ্য। দক্ষিণপন্থী চিন্তানায়কগণ বিশ্বাস করিতেন এবং এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া কাজ করিতেন যে যদি স্বাভাবিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় কোন প্রকারে বল প্রয়োগ করা না হয়, তবে সবকিছুই ঠিক হইয়া যাইতে পারে। দ্রুতগামীদের বাধা

আর একটি মূলসূত্র হইতেছে — সে-সমস্যার যুক্তিসংগত কোন সমাধান নাই এবং চিন্তা যুক্তিতর্ক ও বিচারবুদ্ধি ছাড়া অন্য উপায়ে সমস্যা সমূহের সমাধান করিতে হইবে। এবং সমস্যা সমূহকে সমূলে উৎপাটিত করিলেই তাহাদের সমাধান হইবে। পুরাতন ঐতিহ্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে শিক্ষা ও অজ্ঞতা, যুক্তিবিচার-বুদ্ধি ও গোঁড়ামী কুসংস্কার, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মধ্যে চিরন্তন সংগ্রামই ইতিহাসের বিষয়বস্তু। অন্য কথায় বলা যায় যে আস্তিকবাদ ও অভিজ্ঞাবাদ, স্বজ্ঞা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধীয় মতবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যে চলিতেছে অন্তহীন সংগ্রাম। এই ধরণের পরস্পর বিরোধী ভাবধারার বিচিত্র বিন্যাস ও বুর্জোয়া সভ্যতার বিরোধী শক্তিসমূহের মধ্যে সংঘাতই হইতেছে বহুলপরিমাণে বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক ভাবধারার ইতিহাস।

৩

বিংশশতাব্দীর রাজনীতি ও চিন্তাধারার গতিবিধি সাধারণ ভাবে আলোচনা করিলে মনে হয় যে বর্তমান সময়ের প্রতিটি ভাবধারা ও আন্দোলনই ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত ধারা ও প্রবণতার স্বাভাবিক বিকাশ এবং সেই হিসাবেই ইহা পরিষ্কার ভাবে বুঝা সহজ। ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বেলায়ও ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া মনে হয়। হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বিচারালয়, জাতিসঙ্ঘ (League of Nations), যুদ্ধোত্তর সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ (U N), প্রাকযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর অসংখ্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরিত বিভিন্ন সামরিক চুক্তি প্রভৃতি সব কিছুর উৎস হইতেছে উদার-নৈতিক আন্তর্জাতিকতাবাদ, এবং ইহাই ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বপ্রকার প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও কর্মের প্রধান উপাদান। ইউরোপীয় রাজনৈতিক উদারনীতিবাদের মহান প্রতিষ্ঠাতাদের (কনর্ডোরস্টে ও হবেসিয়াস) ভাষা ও বক্তব্য এবং উড্র উইলসন বা টমাস ম্যাসারিকের বক্তব্য ও ভাষা হইতে এই গুলির মূলকথা বা দৃষ্টিভঙ্গি তেমন স্বতন্ত্র নয়। ইউরোপীয় উদারনীতিবাদ (European Liberalism) সুসংগত অন্দোলনের আবরণেই সুধীসমাজে পরিচিত। গত তিনশত বৎসরেও এই আন্দোলনের তেমন কোন পরিবর্তন হয় নাই। এই আন্দোলনের মূলে রহিয়াছে বুদ্ধিবাদ। লক্, গ্রোসীয়াস, এবং স্পীনোঁজা এই নীতির গোড়া পত্তন করেন। ইর‍্যাজমাস ও মন্‌টেইনী, (ইটালী রেঁনেসায়) স্যানেকা ও গ্রীক চিন্তানায়কদের লেখায় এই

মতবাদের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এই মতবাদ অনুসারে প্রত্যেক প্রশ্নের একটা যুক্তিসংগত উত্তর আছে। সর্বত্র ও সকল অবস্থায় মানুষ নীতিগতভাবে (অবশ্য যদি চেষ্টা করে) তাহার বিভিন্ন সমস্যার যুক্তিসংগত সমাধান খুঁজিয়া পাইবার সামর্থ্য রাখে। যুক্তিসংগত বলিয়াই এই সব সমাধান সমূহের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের কোন কারণ নাই, এবং ইহার পরিণতি হয় এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থায় যেখানে সত্যের বিজয় অনিবার্য। এই ব্যবস্থায় থাকিবে স্বাধীনতা, শান্তি ও সকলের জন্য অব্যাহত আত্ম-বিকাশের অফুরন্ত সুযোগসুবিধা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইতিহাস সম্পর্কে যে চেতনার উদ্ভব হয় তাহার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পরিকল্পিত এই আড়ম্বরহীন বা ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদের সহজ ও কঠোর রূপের কিছুটা পরিবর্তন হয়। তখন বুঝা গিয়াছিল যে মানুষের প্রগতির পেছনে রহিয়াছে বহুবিধ জটিল কারণ, কিন্তু যুক্তিবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের গোড়ার দিকে ইহা সঠিকভাবে কল্পনা করা যায় নাই এবং শিক্ষা ও যুক্তিবাদ সম্পর্কীয় প্রচার-কার্য সব সময়ে ও সব ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। বিশেষ বিশেষ কারণ ও ঘটনা প্রবাহের প্রভাবে মানব সমাজ ও সম্প্রদায়ের আকৃতি ও রূপ ইতিহাসের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার মূলে রহিয়াছে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক অবস্থা ও কারন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এইসব কারণ অতীব ছলনাময়ী ও আবেগময়ী এবং ইহাদের সঠিক স্বরূপ নির্ণয় করা খুবই দুরূহ কাজ। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কৃতি সম্পর্কীয় ঘটনাপ্রবাহ ও প্রভাব কাজ করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই সব কারণ ও ঘটনা প্রবাহের প্রভাবের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরেপিত হইয়াছিল। কিন্তু ডিডারো ও বেথামের পরিকল্পনায় ইহাদের গুরুত্ব তেমন স্বীকৃতি লাভ করে নাই। শিক্ষা ও সমাজিক অন্যান্য কাজ এইভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যার ফলে মানুষের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা মেটানো সম্ভবপর হয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাই মানুষ ও মানুষের প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দিষ্ট ও প্রয়োজনীয় ছাঁচে গড়িয়া তোলার পদ্ধতি কে কিছুটা দুরূহ করিয়াছিল। আগেকার দিনে এই বিষয়ে মানুষ বিশেষ আশাবাদী ছিল।

তথাপি মৌলিক কর্মসূচী বিভিন্ন প্রকারে তার সার্বিক প্রভাব বিস্তার করিয়াই চলিয়াছে। দক্ষিণপন্থীদের বেলায়ও যেমন, বামপন্থীদের বেলায়ও ইহা সমানভাবে প্রযোজ্য। দক্ষিণপন্থী চিন্তানায়কগণ বিশ্বাস করিতেন এবং এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া কাজ করিতেন যে যদি স্বাভাবিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় কোন প্রকারে বল প্রয়োগ করা না হয়, তবে সবকিছুই ঠিক হইয়া যাইতে পারে। দ্রুতগামীদের বাধা

দিতে হইবে যাহাতে তাহারা মন্থরগামীদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া না যায়। এই ভাবে সকলেই শেষে তার গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইবে। শতাব্দীর প্রথম ভাগে বোঁন্যাল্‌ত এই মতবাদই প্রচার করেন এবং আদিমপাপে (original sin) বিশ্বাসীদের আশাবাদ ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে। নিম্নে বর্ণিত শর্ত ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা সমূহ মান্য করা হইলে দক্ষিণপন্থী চিন্তানায়কদের মতে যুক্তিসংগত সংস্কার ও পরিবর্তন সম্ভবপর ও তাহা কাম্যও বটে। (১) উদারপন্থীদের "কল্পনাশক্তি বিহীন, কৃত্রিম যান্ত্রিক" সমতা সাধনের পদ্ধতিও কার্যপ্রণালী হইতে যদি দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক কাঠামোর চিরাচরিত পার্থক্য রক্ষিত হয়; (২) অস্পষ্ট, ঐতিহাসিক, স্বাভাবিক, বা ঐশ্বরিক স্বাতন্ত্র্য সমূহকে যদি সমজাতীয় একক অখণ্ড বস্তুরজ্ঞানে একই শ্রেণীতে রূপান্তরিত না করা হয়; এবং সেই সব বস্তুর গতিধারা অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত এবং যে শাসক শ্রেণী মানুষের চিরব্যবহারসিদ্ধ অধিকার ও অভ্যাসকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে তাহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সে সব দেশে অতীতের পবিত্রতাকে অনবহিত স্খলন হইতে রক্ষা করার জন্য যদি অভয়পত্র বা রক্ষাকবচ সৃষ্টি করা হয় এবং অভয়-পত্রের মান্য করার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়, তাহা হইলে রক্ষণশীলপন্থীরা যোগ্য বিশেষাজ্ঞগণ কর্তৃক মানুষের সাধারণ কাজকর্মের সচেতন নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে অনেকখানি সমর্থন দিতে প্রস্তুত। শুধু বিশেষাজ্ঞগণ নয় বরং সমাজের প্রতি স্তরের ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বা তাহাদের প্রতিনিধিদেরকেও সহযোগিতা দানে তাঁহারা উৎসুক।

ঊনবিংশশতাব্দীর শেষভাগে এই মেজাজ ও মনোভাব ইউরোপে বেশ প্রসার লাভ করিয়াছিল। শুধু পশ্চিমে নয়, প্রাচ্যদেশেও এই মনোভাব বিরাজ করিত। অবশ্য পূর্ব বা পরবর্তি যুগের রাজনৈতিক সংগ্রামে আভিভুত ঐতিহাসিকগণ ইহা স্বীকার করিতে রাজী নন। এই মনোভাবের প্রভাবে ও ফলে পাশ্চাত্য দেশের একটা বিপুল অংশ জুড়িয়া রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের প্রসার ঘটিয়াছে। ইহার ফলে পরবর্তি শতাব্দীতে সকল শ্রেণীর মানুষ অল্পবিস্তর ক্ষমতা অর্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঊনবিংশশতাব্দীতে বহু প্রতিনিধিত্ববিহীন মানব সম্প্রদায় বা গোষ্ঠি আত্মপ্রকাশ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের কঠোর সংগ্রামে নিয়োজিত ছিল। এই সংগ্রামে যাঁহারা পুরোভাগে বা নেতা ছিলেন তাঁহারা বীর ও শহীদ আখ্যা পাইয়াছিলেন। ধার্মিক, স্বার্থত্যাগী, সুদক্ষ, সমাজসেবী, প্রতিভাবান নেতা ও পুরুষ হিসাবে সমাজ তাঁহাদিগকে বরণ করিয়াছিল। মানুষের মুক্তিকামী এ ধরণের সত্যকার সংগ্রামে তাঁহাদের জন্ম হয়। ভিক্টোরিয়ান যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষুধা বিংশ-শতাব্দীতে অনেকখানি পরিতৃপ্ত হইয়াছে। বিংশশতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের

অধিকাংশ লোকের আর্থিক অবস্থার অপূর্ব উন্নতি হইয়াছে। এই উন্নতির মূলে রহিয়াছে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা লইয়া প্রণীত আইন যাহার ফলে সমাজ ব্যবস্থা রূপান্তরিত হইয়াছে। নৈতিক আদর্শবাদের অবনতি এই ধারার এক অভাবিত-পূর্ব পরিণতি। টক্‌ভাইল, বুর্কাভ্যাট, হ্যারজেন ও নীৎসের লেখায় এই পরিণতির আভাস পাওয়া যায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে রোমান্টিক বিদ্রোহের তীক্ষ্নতা ও তীব্রতারও অবনতি হইয়াছে এবং রোমান্টিক বিদ্রোহের তীক্ষ্নতা ছিল আগেকার অসন্তুষ্ট সমাজ গোষ্ঠির সংগ্রামের প্রাণধর্মজাত। এই সমাজ গোষ্ঠির মধ্যে যদিও তীব্র বিরোধ ছিল, তথাপি তাহারা অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠি, ধর্মযাজক ও যুদ্ধরত বর্বরদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হইয়া সংগ্রাম করিয়াছিল ঃ বর্তমানে সমাজে অন্যায়, অবিচার অত্যাচার, দুঃখ-বেদনা যাহাই হউক — আকারে, ব্যাপকতায় ও সংখ্যায় তাহা অতীতের চাইতে কোন পক্ষে কম নয় – উদার ও উচ্চতর বাগ্মিতার মহান স্মৃতিলিপিতে তাহাদের আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা অতীব ক্ষীণ। কারণ এই ধরণের অনুপ্রেরণা আসে তখনই, যখন সমাজের সকল শ্রেণীই উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হয়। উৎপীড়িত মানবগোষ্টির মধ্যে যাহারা সর্বাপেক্ষা স্পষ্টবাদী ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া উন্নত, তাহাদের নেতৃবৃন্দ কখনও কখনও নিজস্ব সমাজ শ্রেণীস্বার্থের অনেক উর্ধে উঠেন এবং তাঁহাদের বক্তব্যে ভাষায় ও কাজে সকল উৎপীড়িত মানুষের মর্মবেদনা অভিব্যক্তি পায়। ক্ষণিকের জন্য তাঁহাদের উক্তি সার্বিক রূপ ধারণ করে।

যখন সমাজের সকল স্তরের বা শ্রেণীর লোক রীতিসিদ্ধভাবে ক্ষমতার আসনে অধিষ্টিত হইবার উদ্যোগ করিয়াছে তখন সেই অবস্থা স্বার্থহীন উচ্চস্তরের লোকদের বাগ্মিতার পক্ষে অতীব প্রতিকূল। ইহার কারণ অনেক ও বহুবিধ। স্বার্থহীনতার কারণ এই অন্ধকার ও শূন্যতায় উজ্জ্বল তারকার মত প্রদীপ্ত নীতিসমূহের বাস্তব রূপায়ণ তখনও সুদূরপরাহত থাকে এবং অন্তর্দৃষ্টি বিশৃঙ্খলতা ও দুর্বোধ্যতা হইতে তখনও থাকে মুক্ত। যখন কোন আদর্শের বাস্তবে রূপায়িত হইবার সুচনা হয়, তখন এক ধরণের আপোষরূপ করিতে হয় এবং বাহিরের জগতসম্বন্ধে কুয়াশাচ্ছন্ন ধারণার ফলে স্বার্থহীন মনোভাবে এসময়ে বেশ কিছুটা ভাটা পড়ে। যাহারা এক-বার ক্ষমতার স্বাদ পাইয়াছেন বা পাওয়ার আশা করিতেছেন, তাহারা বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্যভাব পোষণ করিতে পারেন না। সেই আদর্শের বাস্তবরূপায়ণের সঙ্গে আগেকার আশা ও ভয়ের যে গরমিল বা অসংগতি তাহা সংঘাতের রূপ পায় এবং সংঘাতের ফলে বৈরাগ্যভাবের উদ্ভব হয়। সেই মতবাদ ও আন্দোলন সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং সেইজন্য যার মাধুর্য বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ

করিতে হইলে এবং পরবর্তি যুগের প্রসঙ্গকে পরিহার করিতে হইলে, কল্পনা-শক্তির অসাধারণ ও বিশেষ প্রয়োগের আবশ্যক। জাতীয়তাবাদের বাস্তব রূপায়ণের পূর্বে মনে করা হইত যে নীতির দিক হইতে ইহার সঙ্গে আন্তর্জাতিকতাবাদের কোন অসংগতি নাই, অথবা নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্তিসংগত সমাজ সংগঠনের কোন অসংগতি নাই। এককালে রক্ষণশীল ও তাহাদের বিরোধীদলসমূহ ইহাতে বিশ্বাস করিত। যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া প্রগতির গতিকে ইতিহাস আরোপিত সীমার বাহিরে যাইতে দেওয়া উচিত নয় এবং বাস্তবজগতের প্রত্যক্ষ অনুভূতি স্মৃতি ও কল্পনার চাইতে অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ — এই দুই মতবাদের মধ্যে যে পার্থক্য তাহাই ছিল দুইপক্ষের মধ্যপন্থীদের মধ্যকার প্রভেদ। এই সময়ে উদারপন্থীরাও ইতিহাস-বাদের প্রভাব অনুভব করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা আরও স্বীকার করিত যে, সমাজ জীবনে কিছুটা সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। বল্গাহীন ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রসূত উদ্যমের বর্বরতাকে প্রশমিত করা, দুর্বলের অধিকার ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করা এবং মানুষের মৌলিক অধিকার সমূহের নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য ইহার প্রয়োজন ছিল। এই সব মৌলিক অধিকার ব্যতিরেকে জীবনের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার মত শান্তি, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা সম্ভবপর নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উদারপন্থীদের এই সব বিশ্বাস ও মতবাদের দার্শনিক পটভূমি খানিকটা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য ছিল। অধিকার সমূহকে প্রাকৃতিক, সহজাত, সত্য ও ন্যায়ের শর্তশূন্য মানদণ্ড হিসাবে গন্য করা হইত। অধিকার সম্পর্কীয় এই মতবাদের সঙ্গে পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতাবাদ ও উপযোগবাদের কোন সংগতি ছিল না। গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে সংখ্যালঘু বা বিসংবাদী ব্যক্তির অলঙ্ঘনীয় অধিকারের প্রতি বিশ্বাসের কোন অপরিবর্তনীয় সামঞ্জস্য ছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত দক্ষিণপন্থীরা এই সব নীতি ও আদর্শের বিরোধী ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের মধ্যকার অসংগতি, ছিল সুপ্ত বা নিছক তত্ত্বমূলক আলোচনার বিষয়বস্তু। এই সব আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার কোনপ্রকার জরুরি তাগিদ ছিল না। এই অসংগতির ফলেই যুক্তিবাদী সমালোচনার মূল্য বাড়িয়া যায় এবং যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির মারফতে সকল প্রকার সমস্যা ও প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভবপর হয় বলিয়া মনে করা হইত। রক্ষণশীল পন্থীদের মত সমাজতন্ত্রবাদীরাও অনমনীয় ঐতিহাসিক নিয়মকানুনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত। উদারপন্থীরা ইতিহাসের বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিয়া সময়হীন বস্তুনিরপক্ষতা-প্রসুত ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া আইন প্রণয়ন করিত

বলিয়া সমাজতন্ত্রবাদীরা তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত। এইজন্য ইতিহাস একদিন পরিশোধ নিবেই। উদারপন্থীদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদীরাও যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের চূড়ান্ত মান বা মূল্য ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সর্বপ্রকার তথ্যের পর্যালোচনা ও তত্ত্ববিষয়ক বিবেচনার উপর ভিত্তি করিয়া নীতিনির্ধারণ-পদ্ধতিতে বিশ্বাস করিত। সমাজতন্ত্রবাদীরা রক্ষণশীলদের আরও সমালোচনা করিত এই জন্য যে তাহারা তথ্যের মিথ্যা বা ভুল ব্যাখ্যা করিয়া শোচনীয় স্থিতাবস্থার সমর্থন করিত এবং দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচার অবিচারকে উপেক্ষা করিত। তাহারা ইতিহাসকে উপেক্ষা করিত না বরং ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া সত্য বলিয়া প্রতীয়মান, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়, এই ধরণের নৈতিক ভিত্তির উপর নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখিবার প্রয়াস পাইত। সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সত্যিকার বিপ্লবীও ছিল। পাশ্চাত্য জগতে ইহা এক নূতন ও বিস্ময়কর ঘটনা হিসাবে দেখা দিল। তাহারা যে সকল দলের তীব্র সমালোচনা করিত, তাহাদের সঙ্গে একমত হইয়া সমাজতন্ত্রবাদীরাও মনে করিত যে সব প্রয়োজনীয়তা, স্বার্থ ও আদর্শ সম্বন্ধে মানুষ সচেতন ছিল বা মানুষকে সচেতন করা সম্ভব, সেইসব বিষয়ের ভাষায় ও নামে মানুষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যার ব্যাপারেও রক্ষণশীল, উদারপন্থী, চরমপন্থী ও সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে মতের অনৈক্য ছিল। মানুষের গূঢ় প্রয়োজন, স্বার্থ ও আদর্শ সম্বন্ধেও তাহারা বিভিন্ন মত পোষণ করিত। তথ্য সম্বন্ধে যেমন, উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধেও তেমনই তাহাদের মধ্যে কোন মিল ছিল না। কোন ব্যাপারেই তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এক ব্যাপারে তাহারা সকলেই একমত; তাহারা সকলেই বিশ্বাস করিত যে তাহাদের যুগ বহুবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত। পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসিক শক্তিতে বিভূষিত সকল মানুষই যে সত্যপথ সম্বন্ধে একমত হইতে পারে, সেই সত্যের প্রয়োগ দ্বারা এইসব সমস্যা সমাধান সম্ভব। নীতির দিক হইতে মার্ক্সবাদীরা এই মতবাদে সন্দেহ পোষণ করিলেও বাস্তবক্ষেত্রে ইহাকে সমর্থন করিত। উদ্দেশ্য যেখানে সফলতা লাভ করে নাই এবং পথ-নির্বাচন যেখানে সীমাবদ্ধ, সেই অবস্থায় সর্বপ্রকার দক্ষতা, উদ্যম এবং বুদ্ধিদীপ্ত ও নৈতিক অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োগ করিয়া উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনই প্রকৃত পন্থা। এই ধরণের মতবাদকে মার্ক্সবাদীরা আন্তরিকতার সহিত সমালোচনা করে নাই। কারও কারও মতে এইসব সমস্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমজাতীয়, আবার কারও মতে নৈতিক বা

ধর্মীয় সমস্যারও সমজাতীয়। আবার অনেকের মতে এইসব সমস্যা স্বজাতীয় এবং ইহাদের সমাধানের জন্য বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োগের আবশ্যক। সমস্যা-সমূহের বিশুদ্ধতা ও অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে সকলেই একমত। সমস্যা সমাধানের সর্বপ্রকার পথই ধৈর্য সহকারে বিচার করা আবশ্যক। সমস্যা সম্পর্কে অজ্ঞতা বা সমস্যার অস্তিত্ব সম্পর্কে অস্বীকৃতি মোটেই লাভজনক হয় না।

এই ধরনের সাধারণ ধারণা প্রগাঢ়ভাবে বুদ্ধিবাদীর। রোমান্টিক আন্দোলন এই সব সাধারণ ধারণা সমূহকে আন্তরিক উষ্মার সহিত অস্বীকার করে। কারলাইল ডস্তয়ভস্কী, বডিলেয়ার, টলষ্টয় ও নীৎসে — প্রমুখ বিশিষ্ট চিন্তানায়কগণ প্রকাশ্যভাবে এই সবের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন। আরও অনেক চিন্তাবিদ যেমন বুক্সর, কার্কেগার্ড, বাকুনীন, ও লিওনটিব — সকলেই অসাধারণ, প্রগাঢ় গভীরতা ও মৌলিকতার সঙ্গে প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। বর্তমানে এই প্রতিবাদের স্বরূপ পরিষ্কারভাবে ধরা পড়িয়াছে। এই সকল চিন্তানায়ক কোন বিশেষ এক আন্দোলনের প্রতিনিধি নন বা সহজে অনুমেয় কোন ভাবধারার স্রষ্টা নন। কিন্তু একটা বিশেষ বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে অতিব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। যুক্তিতর্ক ও বিচার বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল রাজনৈতিক কার্যবিধির গুরুত্ব তাঁহারা অস্বীকার করেন। এই জন্য রক্ষণশীল তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। তাঁহাদের মতে যে কোন প্রকারের যুক্তিবাদই ভ্রমপূর্ণ। যুক্তিবাদ মানব চরিত্রের মিথ্যা বা ভুল বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ মানুষের কার্যধারার অনুপ্রেরণা এমন সব উৎস হইতে আসে সে সম্বন্ধে যুক্তিবাদী চিন্তাবিদগণ কিছুই ভাবেন নাই। অথচ এইসব ধীর, স্থির, শান্ত ও যুক্তিবাদী চিন্তানায়কদের অভিমতই সাধারণের নিকট সম্মানিত ও গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় ছিলেন নগন্য। মতের দিক হইতেও তাঁহারা পরস্পর বিরোধী, তাঁহাদের অভিমত মনস্তাত্ত্বিক অবনতির রূপায়ণ হিসাবে বিবেচিত হয়। তাঁহাদের অসাধারণ শক্তি ও দক্ষতাকে প্রশংসা করিলেও উদারপন্থীরা তাঁহাদের মানব সম্প্রদায় সম্পর্কিত মতবাদকে একান্ত দূষিত ও ভ্রান্তিমূলক বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। উদারপন্থীরা হয় এই ধরণের মতবাদকে উপেক্ষা করিত নতুবা প্রচণ্ডভাবে প্রত্যাখ্যান করিত। অতিরঞ্জিত যুক্তিবাদী, উদারপন্থী ও সমাজতন্ত্রবাদীরা উগ্র আশাবাদের বিরোধী বলিয়া রক্ষণশীলরাও তাঁহাদিগকে মিত্র হিসাবে গন্য করিত। সমাজতন্ত্রবাদীরা তাঁহাদিগকে বিপথগামী প্রগতিবিরোধী বলিয়া মনে করিত। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়াকে যোগ্য কাজ বলিয়া গন্য করিত না। ইঁহাদিগকে কেন্দ্র

করিয়াই দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের চিন্তাধারার প্রধান গতি প্রবাহিত হয়। অন্ধকার যুগের প্রতীক ব্যতিরেকে তাহারা আর কি? মানব সভ্যতার ইতিহাসের প্রগতিশীল শক্তির নিকট তাহারা হার মানিয়াছে। তাহাদের অনেকেই প্রতিভাবান ব্যক্তি; মেধাবী কবি ও উল্লেখযোগ্য শিল্পী ছিলেন। মার্ক্সবাদ মূলত উচ্চাঙ্গের যুক্তিসম্মত সমাজ ব্যবস্থা হইলেও প্রথম হইতে ইহার মধ্যে একটা অশুভ লক্ষণের অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই অশুভ লক্ষণই এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী। ব্যক্তি বা দলকর্তৃক উদ্দেশ্য-নির্বাচন ও শক্তিশালী গবর্ণমেণ্ট গঠনে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির গুরুত্ব স্বীকৃত হয় নাই। মার্ক্সবাদীরাও তাহাদের উদারপন্থী প্রতিদ্বন্দ্বীদের মত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপাসনা করে ও এই উপাসনাই মার্ক্সবাদের প্রকৃতি স্বরূপ সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা করার পথে বাধা, স্যোরেল ইহাকে প্রাণবন্ত না করা পর্যন্ত মার্ক্সবাদের এই দিকটা অনেকখানি অপরিচিত থাকিয়া যায়। স্যোরেল ইহাকে বার্গসনে যুক্তিবাদবিরোধী মতবাদের সঙ্গে সংযুক্ত করেন এবং এই মতবাদ স্যোরেলের চিন্তা-ধারাকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। ভিন্নধরণের ঐতিহ্যবাহী লেনিন ইহাকে এক শক্তিশালী বাস্তব পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করেন। এই মতবাদ কতখানি তাহাদের কার্যধারাকে প্রভাবিত করে সে সম্বন্ধে লেনিন সজাগ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এবং তাঁহার বর্তমান অনুবর্তীরাও সম্ভবত অনুরূপ অবস্থাতেই আছেন। অথবা সচেতন থাকিলেও তাহারা আজ পর্যন্ত কোনদিন ইহাকে স্বীকার করেন নাই। এই পরিবেশে বিংশশতাব্দীর জন্ম।

৪

সময়ানুক্রমিক সীমান্ত ভাবধারার ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। বিগত যুগের চিন্তাধারার গতি নূতন যুগের চিন্তাধারার স্রোতে শান্তিপূর্ণভাবে প্রবাহিত হয়। বর্তমানে এই প্রতিমূর্তি রূপান্তরিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ও সামাজিক শক্তির সচেতন ও অচেতন বিরোধিতা ও প্রচলিত প্রতিষ্ঠান ও অভ্যাসের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ফলে মানবহিতৈষী উদারনীতিবাদ প্রচেষ্টা ও উদ্যমের সহিত ইহার সমাজ-সংস্কারের প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতেছে। এই নীতি পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাজ করিবার মত যথেষ্ট শক্তি অর্জন করে এবং সেই শ্রেণীকে সংঙ্ঘবদ্ধ করিতে ইহা ক্রমশই বাধ্য হয়।

ক্রমবিকাশশীল ফ্যাবীয়ান সমাজতন্ত্রের যুদ্ধরত সাম্যবাদ ও শ্রমিকতন্ত্রবাদে

রূপান্তরের ইতিহাস ততটা ভাবধারা বা নীতির ইতিহাস নয় যতটা পার্থিব তথ্যের সঙ্গে তাহাদের সংঘাতের ইতিহাস। এই কথা সামাজিক গণতন্ত্র ও শ্রমিকসংঘ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এক দিক হইতে সাম্যবাদ নীতিবাদী মানবহিতৈষী মতবাদের মূর্ত প্রকাশ। আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতির অনুসরণের ফলে ইহা এক চরম সীমায় উপনীত হয়। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যেন মার্ক্সবাদ ও রাজনৈতিক উদার নীতিবাদের মধ্যে তীক্ষ্ণ ব্যবধান রহিয়াছে। কিন্তু উভয় মতবাদেরই মূলমন্ত্র হইতেছে — মানুষের চরম উৎকর্ষসাধন, স্বাভাবিক দোষ ত্রুটিবিহীন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা, এবং সাম্য ও স্বাধীনতার সামঞ্জস্যে বিশ্বাস। এই ধরণের ঐতিহাসিক রূপান্তর সব সময়েই ঘটিতে পারে, বা হঠাৎ কোন বিপ্লবী পদ্ধতির মাধ্যমেও সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যেভাবেই হউক না কেন ইহাকে বোধগম্য ও যুক্তি-সংগত খাতে প্রবাহিত হইতে হইবে। এই পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করা হইবে বোকামী ও অবাস্তব। লক্ষ্য ও পদ্ধতিতে উদার নীতিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে যে তীব্র ও আপোষহীন ব্যবধান রহিয়াছে এই সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন সংশয় নাই। কিন্তু প্রান্তদেশে একে অন্যের সঙ্গে মিলিয়া যায়। যদিও মার্ক্স-বাদীরা মনে করে যে মানুষ তাহার চিন্তা ও কর্মে তাহার শ্রেণী ব্যবস্থা কর্তৃক প্রভাবান্বিত হয়, তথাপি সেই শ্রমিক শ্রেণী, ভবিষ্যতে যাহারা জয়ী হইবে, তাহাদের যুক্তির উপরই অনেকখানি নির্ভরশীল। সাম্যবাদীদের মতে এই মজুরশ্রেণীই বিনা দ্বিধায় ভবিষ্যতের মোকাবিলা করিতে পারে। অনাগত ও অজানা ভবিষ্যতের ভয়ে তথ্যকে মিথ্যায় পর্যবেসিত করার তাহাদের কোন প্রয়োজন নাই। সকল বুদ্ধিজীবি তাহাদের সমাজ-শ্রেণী-প্রসূত পক্ষপাতিত্ব ও কুসংস্কার হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়া-ছেন, তাহাদের বেলায়ও এই কথা প্রযোজ্য। সমাজ সংগ্রামে বিজয়ী দলের সঙ্গে ইহারাও যোগ দেন। যেহেতু তাহারা মুক্তিবাদী, সেই গণতন্ত্রের সুযোগসুবিধা ও বুদ্ধি-বৃত্তির-প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ ও অধিকার তাহাদিগকে দেওয়া হয়।

১৯০৩ সালে একটা বিশেষ ঘটনার পরিণামে যে প্রক্রিয়া চরম পরিণতি লাভ করে, তাহার ফলে বর্তমান জগতের ইতিহাস পরিবর্তিত হয়। সেই বৎসর ব্রাসেল্‌সে রাশিয়ার Social Democratic Partyর অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ইহা শেষ হয় লণ্ডনে। সেই সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল — পার্টির কাজকর্ম কি পরিমাণে কেন্দ্রীভূত করা হইবে, পার্টির কেন্দ্রীয় অঙ্গ পার্টির অন্যান্য সদস্য, কর্ম পদ্ধতি ও আদর্শ নির্ণয়ে কতখানি কর্তৃত্ব করিবে; এবং পার্টির উপরের তলায় অধিষ্ঠিত সদস্যগণ পর্যায়ক্রমে অবস্থিত নীচের তলার সদস্যদের

উপর কতখানি কর্তৃত্ব ও বিধিনির্দেশ আরোপ করিবে। এক কথায় কেন্দ্র হইতে পার্টির কার্যধারা ও আচরণ কতখানি নিয়ন্ত্রিত হইবে, ইহাই ছিল সম্মেলনের আলোচনার প্রধান বিষয়। প্যাসভস্কি নামে জনৈক সদস্য এক গুরুতর ও মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে, পার্টির যে অঙ্গ বা অংশ বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল, ইহার জন্য নিরঙ্কুশ ক্ষমতার প্রয়োজন। লেনিন ও তাঁহার বন্ধুগণ ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্যাসভস্কির প্রশ্ন হইল যে শর্তশূন্য ক্ষমতা প্রয়োগের উপর যে জোর দেওয়া হয় তাহার সঙ্গে, যে মৌলিক স্বাধীনতা ও অধিকারের বাস্তব রূপায়ণে সমাজতন্ত্রবাদীরা বিশ্বাসী, তাহার কোন সংগতি নাই। তাহার প্রশ্ন ছিল যে মৌলিক ন্যূনতম নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা — যাহার উপর মানুষের ব্যক্তিত্বের পবিত্রতা নির্ভরশীল—পার্টির নেতারা ইচ্ছা করিলেই কি তা লঙ্ঘন করিতে পারেন? রাশিয়াতে মার্ক্সবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্লেখানব এই প্রশ্নের জবাব দেন। প্লেখানব এই আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত, মার্জিত, ন্যায়তঃ সংবেদনশীল মহান পণ্ডিত। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তীক্ষ্ণ, প্রগাঢ় ও ব্যাপক। বিশবৎসর তিনি পশ্চিম ইউরোপে বসবাস করিয়াছিলেন এবং সেখানকার সমাজতন্ত্রবাদের নেতারা তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্মান করিত। রাশিয়ার বিপ্লবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সুসভ্য, অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও বিজ্ঞানধর্মী চিন্তার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। গুরুগম্ভীরভাবে ও ব্যাকরণের প্রতি চমৎকার অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া প্লেখানব ঘোষণা করিলেন Salus Revolution Suprema Lex। বিপ্লবের প্রয়োগ সকলের উপরে। বিপ্লব যদি চায়, বিপ্লবের প্রয়োজনে, সবকিছুই — গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ব্যক্তির অধিকার বিপ্লবের বেদীমূলে উৎসর্গ করিতে হইবে। বিপ্লবের পরে রাশিয়ার ভোটারগণ যে আইনপরিষদ নির্বাচিত করিবে, তাহা যদি মার্ক্সবাদী কার্যপ্রণালীর অনুকূল হয়, তবে ইহার অস্তিত্ব বজায় রাখা হইবে এবং যদি তাহা না হয়, তবে ইহাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। বুর্জোয়া উদারপন্থীদের আদর্শ ও নীতির প্রতি শ্রদ্ধায় যাহাদের মন আবিষ্ট, তাহাদের পক্ষে মার্ক্সবাদ সম্মত বিপ্লবকে বাস্তবে পরিণত করা সম্ভবপর নহে। নিঃসন্দেহে এই সব আদর্শে যা কিছু মূল্যবান, ভাল ও কাম্য, বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী শেষ পর্যন্ত তাহা কার্যে পরিণত করিবে। বিপ্লবের সময় এই সকল আদর্শ লইয়া তন্ময় থাকা ইহার গুরুত্ব ও আন্তরিকতার অভাবের জলন্ত প্রমাণ।

প্লেখানব উদার, মুক্ত ও স্বাধীন ঐতিহ্যে মানুষ। পরে তিনি নিজেই এই অবস্থা হইতে সরিয়া পড়েন। যে মহান মানুষ তাঁহার সুরুচিপূর্ণ ও কর্মময় জীবনের বেশীর ভাগ পাশ্চাত্য শ্রমিক ও নেতাদের মধ্যে যাপন করেন, কল্পনাবিলাসী বিশ্বাস ও সুসভ্য

নৈতিকতার প্রতি এই বর্বরোচিত অবজ্ঞার সংমিশ্রণ তাঁহার নিকট যে বীভৎসরূপে দেখা দিবে ইহাতে অবাক হইবার কিছু নাই। সামাজিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী লোকের ন্যায়, প্লেখানবও একান্তভাবে ইউরোপীয় আদর্শ ও ভাবধারায় প্রভাবান্বিত, তাঁহার পক্ষে এমন নীতিতে বিশ্বাস করা—যে নীতি ডষ্টয়ভস্কীর "The Possessed" নাটকের অন্যতম নায়ক সীখালভের ভাষায় সীমাহীন স্বাধীনতা হইতে আরম্ভ করিয়া সীমাহীন স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হয় — কিছুতেই সম্ভবপর নয়। কিন্তু লেনিন এই মতবাদ ও ব্যবস্থাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যাহা তাঁহার সহকর্মীদের নিকট বীভৎস বিবেচিত হইল। কিন্তু অতি সহজে এবং বিনা দ্বিধায় তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন। কোন কোন দিক হইতে তাঁহার এবং অষ্টাদশ ও ঊনবিংশশতাব্দীর আশাবাদী যুক্তিবাদীদের মতের মধ্যে মিল ছিল। বলপ্রয়োগ, পীড়ন, প্রাণদণ্ড ও ব্যক্তিতে স্বাতন্ত্র্যের নিরোধ, স্বয়ং নিযুক্ত মুষ্টিমেয় লোকের শাসন এই সব অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য আবশ্যক, বিশেষ করিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তিশালী শত্রু ধ্বংস না হয়। অধিকাংশ মানুষকে, প্রতারক ও দুরাত্মাদের অত্যাচার, অবিচার ও উৎপীড়ন হইতে মুক্ত করার জন্য এই নীতি ও পদ্ধতির প্রয়োজন। অত্যাচার, অজ্ঞতা, অলসতা ও পাপমুক্ত মানুষ তখন হইবে স্বাধীন এবং তাহাদের স্বভাব ও সত্যিকার রূপের অন্তহীন সম্পদের প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনাকে বাস্তবে পর্যবসিত করার পূর্ণ সুযোগ পাইবে। এই স্বপ্নের সঙ্গে ডিজারো, স্যাণ্ট-সাইমন বা ক্রপট্‌কীনের স্বপ্নের মিল ছিল। যে উপায় ও পদ্ধতিতে ইহাকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, সেই উপায় বা পদ্ধতি সম্পর্কীয় ধারণাই হইতেছে ইহার আপেক্ষিক অধীনতা। যদিও মনে হয় যেন এই মতবাদ শুধু পদ্ধতি-সম্পর্কীয় মত এবং ইহার উৎস হইতেছে ব্যবিউন, ব্ল্যাঙ্কুই বা মার্ক্স — তবুও পাশ্চাত্য-সমাজ-তন্ত্রবাদীরা ঊনবিংশশতাব্দীর শেষভাগে যে কর্মসূচী প্রণয়ন করে তাহা হইতে ইহা অনেক ভিন্ন। এই পার্থক্য চরম ও চূড়ান্ত; এবং ইহা নূতন যুগের সূচনা করিল।

লেনিন চাহিয়াছিলেন অল্পসংখ্যক পেশাদারী রাষ্ট্র বিপ্লবীদের জন্য অসীম ক্ষমতা। ইহাদিগকে একটি মাত্র বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং তাহারা বিরামহীনভাবে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিবে। ইহার কারণ ও প্রয়োজনীয়তা ছিল অতীব সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও পূর্ববর্তী সংস্কারক ও রাজদ্রোহীদের উপদেশ ও প্ররোচনার মারফতে সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা — এই পদ্ধতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই পদ্ধতির ব্যর্থতার

কারণও তাহাদের নিকট স্পষ্ট ছিল। এই সব পদ্ধতি ভ্রান্ত মনস্তত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসবাদ প্রসূত। গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে যাহারা বিশ্বাস করেন, তাহারা মনে করেন যে মানুষ সচেতন বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া কাজ করে এবং এই সচেতন বিশ্বাসকে যুক্তিতর্কের মারফতে পরিবর্তিত করা যায়। মার্ক্সের মতে এই ধরণের বিশ্বাস ও আদর্শ হইতেছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবে নির্ধারিত মানব শ্রেণী সমূহের অবস্থার রূপায়ণ বা প্রতিচ্ছবি। এবং প্রত্যেক ব্যক্তি অনিবার্যভাবেই একটি শ্রেণীর সদস্য হইবে। মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌সের মতে প্রত্যেক মানুষের বিশ্বাস তাহার সামাজিক শ্রেণীর অবস্থান দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এই সামাজিক শ্রেণীর অবস্থান পরিবর্তিত না হইলে, সাধারণ মানুষের বিশ্বাসেও কোন পরিবর্তন আসে না। রাষ্ট্রবিপ্লবীর প্রকৃত কাজ হইতেছে এই বস্তুনিষ্ঠ অবস্থানের পরিবর্তন করা বা নিপীড়িত মানবশ্রেণীকে তার ঐতিহাসিক কাজের জন্য প্রস্তুত করা ; এক কথায় প্রভাবশালী শ্রেণী সমূহকে উৎপাটিত করিয়া সাম্যবাদের ভিত্তিতে নূতন সমাজ বিন্যাস করা।

লেনিন ইহা অপেক্ষা আরও অনেক দূরে গিয়াছিলেন। তাঁহার কার্যধারার পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়. তিনি মনে করিতেন যে শ্রেণী স্বার্থের প্রভাবে যাহারা মার্ক্সবাদের সততা বুঝিতে ও সেই অনুসারে কাজ করিতে অক্ষম, তাহাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও যুক্তিতর্কের অবতারণা করা সম্পূর্ণরূপে নিস্ফল। অধিকন্তু লেনিন বিশ্বাস করিতেন যে সাধারণ মজদুর শ্রেণী এত অজ্ঞ যে ইতিহাস তাহাদের উপর যে কাজ অর্পণ করিয়াছে তাহারা ইহার তাৎপর্য গ্রহণ করিতে অক্ষম। লেনিন আরও দেখিলেন যে সম্মুখে রহিয়াছে মাত্র দুইটি পথ এবং ইহার যে কোন একটি তাঁহার বাছিয়া লইতে হইবে। প্রথম পন্থা হইতেছে অধিকারচ্যুত অগণিত মানবশ্রেণীকে জীবন-চেতনা-প্রসূত সমালোচনায় উদ্দীপিত করিয়া তোলা; ইহার ফলে তাহাদের বিচারশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি জাগিয়া উঠিবে। কিন্তু ইহাতে প্রচুর আলোচনা ও বাদপ্রতিবাদের অবতারণা হইবে এবং বুদ্ধিজীবিরা দ্বিধাবিভক্ত ও দুর্বল হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয় পন্থা হইতেছে এই সব অধিকারচ্যুত অগণিত মানবশ্রেণীকে সামরিক নিয়মানুবর্তিতা ও পুনঃ পুনঃ বর্ণিত বিধিব্যবস্থার মারফতে এক অন্ধ ও আজ্ঞাবহ শক্তিতে পরিণত করা। ইহাতে তাহাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার শক্তি রহিত হইয়া যাইবে। যদি পথ বাছিয়া নিতে হয়, তবে গণতন্ত্র বা প্রগতি বা এই ধরণের বস্তুনিরপেক্ষ নীতির নামে পূর্বে-উল্লিখিত পন্থার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে, এবং ইহা দায়িত্বহীনতারই অপর নাম। এই অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ

হইতেছে এমন এক পরিবেশ ও অবস্থার সৃষ্টি করা যাহাতে মানুষের সম্পদ, শক্তি ও সামর্থ্য একটা বিশেষ সুসংগত পদ্ধতি অনুসারে বাড়িয়া উঠে। অধিকাংশ সময়ে মানুষ যুক্তিসংগত সমাধানের অপেক্ষা অযৌক্তিক সমাধানের দ্বারা পরিচালিত হয়। সাধারণ মানুষ এতই অজ্ঞ ও নির্বোধ যে তাহাদিগকে স্ব-নির্বাচিত পথে চলিতে দেওয়া যায় না। টলষ্টয় ও কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যেরা মারাত্মক ভুল করেন — সাধারণ কৃষিমজুরের কোন গভীর বিশ্বাস ও নিজস্ব কোন জীবনযাত্রার ব্যবস্থা নাই ; কৃষিমজুর, শহরের শ্রমিক ও সাধারণ সৈন্য — ইহারা সকলেই এক শ্রেণীর ভূমিকায় এবং নিদারুণ দারিদ্র ও মলিনতায় নিষ্পেষিত। তাহারা ভ্রাতৃঘাতী ও আত্মঘাতী সংগ্রামে ও বিরোধে উন্মত্ত। কঠোর ও নির্মম পরিচালনায় সমর্থ নেতাই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে, এবং তিনিই জানেন কি উপায়ে মুক্ত দাসগণকে সুসংগত ও সুপরিকল্পিত প্রণালীতে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হয়। কোন কোন ব্যাপারে লেনিন নিজেই ছিলেন স্বাপ্নিক। তিনি এই বিশ্বাস লইয়াই তাঁহার কাজ আরম্ভ করেন যে প্রচুর শিক্ষা ও সুসংগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সংগঠনের মাধ্যমে প্রায় যে কোন লোক যে কোন কার্য অতীব দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করিতে পারে। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত ও প্রগতি বিরোধী শক্তি ফ্যাসীবাদীদের সিদ্ধান্তের মধ্যে কার্যত-উদ্ভূত মিল রহিয়াছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও ফ্যাসীবাদীরা বিশ্বাস করে যে মানুষ সর্বত্র অসত্য, দুষ্ট, নির্বোধ ও অবাধ্য, এবং ইহাদিগকে দমাইয়া রাখিতে হইবে এবং বিচারবিবেচনাশূন্য উপাসনার বস্তু ইহাদের সম্মুখে ধরিয়া তুলিতে হইবে। স্বচ্ছদৃষ্টি-সম্পন্ন সংগঠকেরা ইহা সামাধা করিতে পারেন। তাহারা এই ব্যাপারে নীৎসে, প্যারিঠো, দ্য জেইজ্যার হইতে ম্যীরাদ পর্যন্ত (ইহারা স্বেচ্ছাচারী শাসনপ্রণালীর পক্ষপাতি ছিলেন) চিন্তানায়কগণ কর্তৃক অনুধাবিত সত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। এমনকি মার্ক্সও এই দলের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল চিন্তানায়কগণ বিজ্ঞানধর্মী ও বিচারবিবেচনা-প্রসূত পদ্ধতি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পদ্ধতির সাহায্যে সমাজবিকাশের প্রকৃত স্বরূপের তাৎপর্য উপলব্ধি করেন এবং তাঁহাদের নিকট মানুষের প্রগতি সম্পর্কীয় উদারনৈতিক মতবাদ অবাস্তব, তুচ্ছ, করুণ ও উদ্ভট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহার স্থূলতা ও ভুল সত্ত্বেও এই প্রধান বিষয়ে হবসের মতই (লকের নয়) সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হবসের মতবাদের স্থূল কথা এই যে মানুষ সৌভাগ্য, বা স্বাধীনতা বা সুবিচার চায় না ; কিন্তু সকলের উপরে সে চায় নিরাপত্তা। এরিষ্টলের মতও সত্য তাঁহার মতে অনেক মানুষই স্বাভাবিকভাবে দাস এবং যখন তাঁহার দাসত্বের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হয় তখন নূতন দায়িত্ব বা বিভিন্নপথের মধ্যে সঠিক

পথ নির্বাচন করিবার মত নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তি-জাত শক্তি তাহাদের থাকে না। এক ধরণের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইলেও তাহারা অন্যধরণের শৃঙ্খল খোঁজে বা সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় বিজ্ঞ ও বৈপ্লবিক আইন প্রণেতা মানুষকে সামাজিক কাঠামো হইতে মুক্ত করাত দূরের কথা — কারণ এই ধরনের কাঠামো ব্যতিরেকে মানুষ নিরাশ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে — বরং তিনি স্বীয়রুচি অনুযায়ী একটা কাঠামো দাঁড় করাইতে সচেষ্ট হন। স্বাভাবিক বা শিল্পবিতান ও যান্ত্রিক পরিবর্তন-জাত নূতন যুগের নূতন চাহিদা ও প্রয়োজন এই কাঠামোতে পূর্ণ হইবে। এই কাঠামোর মূল্য বা মান নির্ভর করে মানুষ কতখানি বিনা প্রশ্ন ও সন্দেহশূন্য বিশ্বাসের সহিত ইহার বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্বীকার ও গ্রাহ্য করে তাহার উপর। অন্যকথায়, একগুঁয়ে নৈরাষ্ট্রবাদী ও আত্মঘাতি মানুষকে দমন ও সহ্য করার মত শক্তি এই কাঠামোর নাই। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিধিব্যবস্থা পৌরাণিক অতিকথা, মতবাদ, আদর্শ, চিন্তা ও ভাষায় গতানুগতিক মননরীতি, ভাবের ধরণ ও প্রকার মূল্য-মান ও সমাজ–স্বীকৃত আচরণ ও অভ্যাসের সমন্বয়ে এই কাঠামো বাস্তবে রূপায়িত হয়। এই কাঠামো ও ইহার উপাদানসমূহ হইতেছে যুক্তিবাদ, চরম উৎকর্ষ, উন্নয়ন ও মানুষের সামগ্রিক জীবনের প্রতিমূর্তি; এবং এইসব মানুষকে সুষ্ঠু ও সুসংগতভাবে কাজ করিতে বাধ্য করে এবং বিশৃঙ্খলা দূর করে। ইহাই হইতেছে হবসের ধারণা-জাত রাষ্ট্রের প্রতিরূপ। এই রূপ ও গ্ন্যমেইজ্যারের মৌলিক ও ইচ্ছাকৃতভাবে পরীক্ষিত প্রহেলিকার মধ্যে দূরত্ব বেশী নয়। গ্ন জেইজ্যারের মতে শাসকগণ এক অলৌকিক শক্তির সাহায্যে ও নামে তাহাদের শাসনকার্য পরিচালনা করে ও শাসিতদের অবাধ্য প্রবণতাকে বশীভূত ও দমন করে। মানুষ যেন বেশী জিজ্ঞাসাবাদ না করে ও প্রতিষ্ঠিত বিধিব্যবস্থার মূলে যেন আঘাত না করে, সেই দিকে শাসকগণ বিশেষ নজর দিয়া থাকে। এই কাঠামোর প্রধান কাজ হইতেছে প্রত্যয় ও নিরাপত্তা বিধান করা এবং এমন কিছু ঘটিতে না দেওয়া যাহাতে প্রত্যয় ও নিরাপত্তা ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া পড়ে। এই মতবাদ অনুযায়ী যে সব শক্তি মানুষের উদ্যম ও শক্তিকে অপব্যয় করে বা একঘেয়ে কর্তব্যের গতিকে শ্লথ করে; রাষ্ট্রনেতাগণ সেই সব শক্তিকে দমন ও প্রতিরোধ করিতে পারে। মানুষের উদ্যম ও একঘেয়ে কর্তব্যের গতিই মানুষকে আত্মঘাতি ভুল, অত্যাধিক স্বাধীনতা, অত্যল্প আত্মসংযম ও ভয়াবহ শূন্যতা হইতে রক্ষা করে। বার্গসনের বক্তব্য এই ধরণের মতবাদ হইতে খুব বেশী ভিন্ন নহে, বিশেষ করিয়া যখন বার্গসন জীবন-প্রবাহ বা গতির সঙ্গে বিচারবুদ্ধি প্রসূত সমালোচনার প্রচারের তুলনামূলক বিচার করেন

ও বলেন যে বুদ্ধিজাত সমালোচনার প্রভাব সৃষ্টি বা একতাবদ্ধ করিতে পারে না, পারে শুধু দ্বিধাবিভক্ত, জাতিরোধ, মৃত, ও সংশক্তিশূন্য করিতে। এই বিষয়ে ফ্রয়েডেরও বিশেষ অবদান রহিয়াছে। নিরেট বোকা মানুষ ও হাতুড়ে ও মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তাগণ মনস্তত্ত্ব-সমাজবিজ্ঞান-পদ্ধতির যে প্রয়োগ করে, ফ্রয়েড ছিলেন ইহার প্রবর্তক। মানুষ তাহার বিশ্বাসের যথার্থ কারণ সম্বন্ধে যাহা ভাবে বা চিন্তা করে, আসল কারণ তাহা হইতে প্রায়ই ভিন্ন এবং এমন সত্য ঘটনা-প্রবাহ ও প্রক্রিয়া হইতে তাহা উদ্ভূত যে সেই সম্বন্ধে মানুষ অচেতন নয় বা সচেতন হইতে মোটেই আগ্রহশীল নয় — এই ধরণের মতবাদকে অতিরঞ্জিত ভাবে প্রচলিত করিয়া এই সব খ্যাতনামা চিন্তাবিদগণ যে যুক্তিবাদী ভিত্তির উপর তাঁহাদের নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে হেয় প্রতিপন্ন করেন। যে সকল সমস্যা ও প্রশ্ন মানুষকে অপ্রতিভ করিয়া তোলে তাহার সমাধান করিয়া মানুষ সুখী হয় না বরং স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক উপায়ে এই সব সমস্যাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়াই মানুষ সুখী হয়। পূর্ব বর্ণিত মতবাদ হইতে এই ধরণের মতবাদে উপনীত হওয়া খুবই সহজ। মনস্তাত্ত্বিক উৎসকে অন্যদিকে ঘুরাইয়া দেওয়ার ফলে সমস্যা সমূহের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইয়াছে যদিও ইহার পেছনে যে প্রশ্ন ও সমস্যা রহিয়াছে তাহার সমাধান তেমন কঠিন নয়।

বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত মানুষ ও মানব সমাজই হইতেছে দক্ষিণ-পন্থী চিন্তাবিদগণের চিন্তাধারার উৎস এবং উপরে বর্ণিত পন্থায় তাহারা ইহার সমাধান করিতে চাহেন। কিন্তু বামপন্থী চিন্তানায়কগণও যে এই পন্থা ও মতবাদকে সমর্থন করেন, ইহাই বস্তুতঃ নূতন ও অভিনব। যুক্তিতর্ক ও বুদ্ধিবিচারশক্তির মূল্য ও প্রকৃত স্বরূপ বা ধর্ম সম্পর্কীয় মনোভাবের এই পরিবর্তনই হইতেছে; বিংশশতাব্দী ও উনবিংশশতাব্দীর মধ্যবর্তী ব্যবধান এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

যে সকল প্রধান ও মূল বিষয় লইয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে এই যে — মানব-সভ্যতার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইবার আরম্ভ কাল হইতে দেখা যায় যে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারশক্তির গতিধারা, শিক্ষার উদ্দেশ্য, ভাব ও আদর্শের সততা বা মূল্যবোধ সম্পর্কে তর্কবিতর্কের সারমর্ম, পূর্ব হইতে অনুমিত কতগুলি চরম ও চূড়ান্ত প্রশ্নের অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে যাহার উত্তর বা মীমাংসা খুঁজিয়া বাহির করাই পরম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। (১) প্রশ্ন উঠিয়াছে যে শিক্ষার মহান ও বিখ্যাত বিষয়বস্তু যেমন অধিবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মানবতত্ত্ব — এই সব বিষয় সমূহ সুনিশ্চিত জ্ঞান ও সত্যকে

আবিষ্কার করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি সম্বন্ধে যে দাবী করে, তাহা কতখানি বৈধ ও যথাযথ ? (২) মানুষের জন্য আদর্শ-জীবন কি এবং কিভাবে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে ? (৩) ভগবান কি আছেন, তাঁর উদ্দেশ্য কি জানা যায় বা এই সম্বন্ধে কি কিছু অনুমান করা যায় ? (৪) বিশ্বের এবং বিশেষভাবে মানব-জীবনের কি কোন উদ্দেশ্য আছে ? যদি থাকে, তবে কাহার উদ্দেশ্য সাধিত হয় ? কি ভাবে ও কি করিয়া এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় ? বিজ্ঞান বা সাধারণ জ্ঞানে যে ধরণের প্রশ্নের সন্তোষজনক ও সাধারণভাবে গৃহীত উত্তর পাওয়া যায় তাহাদের সঙ্গে এই সব প্রশ্নের কি কোন মিল আছে বা নাই ? যদি না থাকে, তবে এই ধরণের প্রশ্ন উত্থাপনের কোন যৌক্তিকতা বা সার্থকতা আছে কি ?

অধিবিদ্যা ও নীতিবিজ্ঞানে যেমন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও তেমন মৌলিক প্রশ্ন বা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার মূল কথা হইতেছে — কেন একজন ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহকে বা ব্যক্তিসমূহের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে মান্য করিবে ? উচ্চশ্রেণীর বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ ও চিন্তাধারার যে সকল চিরপরিচিত বিষয় ও সমস্যার অবতারণা করা হয় তাহা হইতেছে — স্বাধীনতা ও বিধিসংগত ক্ষমতা সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) ও সহজাত অধিকার, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, ব্যক্তির অভিপ্রায়, রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্থান, আন্তর্জাতিকতাবাদ ও সার্বভৌম রাষ্ট্র, প্রতিরাষ্ট্রের পূর্ণ স্বাধীনতা ও পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতা, সমগ্র সমাজের সাধারণ স্বার্থের প্রতীকস্বরূপ অভিপ্রায় বা ইচ্ছা, সংখ্যালঘুদের অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় মতবাদ ও ঈশ্বরতন্ত্র, বৃত্তি-সম্বন্ধীয় মতবাদ ও কেন্দ্রীভূতকরণ সম্পর্কীয় মতবাদ, রাষ্ট্র ও সমাজ, রাষ্ট্র ও পরিবার, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি — এই সব হইতেছে অনুসন্ধানকারী ও তাহার যুগমানসের দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্যান্য বিশ্বাসের সংগতি রাখিয়া এই সকল মৌলিক প্রশ্ন বা সমস্যার উত্তর বা মীমাংসা করার পদ্ধতিসমূহকে সূত্রাকারে পরিণত করার বিবিধ প্রয়াস বা প্রচেষ্টা। কি ভাবে বা কি ধরণের কলাকৌশলের প্রয়োগে এই সকল সমস্যা ও প্রশ্নের মীমাংসা করা যায়, তাহা নিয়া অনেক মতবিরোধ রহিয়াছে এবং কখন কখন মর্মান্তিক সংঘর্ষ হইয়াছে। এই সব সমস্যার সমাধান কেউ খুঁজিয়াছেন পবিত্র ধর্মগ্রন্থে, কেউ ব্যক্তিগত প্রত্যাদেশে, কেউ অধিবিদ্যক পরিজ্ঞানে, কেউ মুনিঋষিদের অভ্রান্ত বাণীতে, কেউ দর্শনে, বা কেউ অভিজ্ঞতা প্রসূত অনুসন্ধানে। আদিকাল হইতে অনেক চিন্তানায়ক ও দার্শনিক এই সকল সমস্যার সমাধানের বিভিন্নভাবে চেষ্টা করিয়াছেন—প্লেটো, এরিষ্টটল, সেণ্ট থমাস, একুইনাস, পোদুওয়ার মপর সীলিয়, ইবনে রুশদ, ও চানক্য।

ম্যাকিয়াভেলী, হবস, লক্, রুস্ত, কাণ্ট, হেগেল, বেন্থাম ও মার্ক্স — বিভিন্ন

যুগের এই সকল প্রখ্যাতনামা দার্শনিকগণ এই সকল সমস্যার বিশ্লেষণ করিয়া সমাধান দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মানব-জীবনে চলার পথে এই সকল সমস্যা বা প্রশ্নগুলি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক যুগেই সন্দেহবাদী লোক ছিল ও তাহাদের মতে এই সব সমস্যার কোন চূড়ান্ত ও শেষ সমাধান নাই। এই পর্যন্ত যে সকল সমাধান করা হইয়াছে, তাহা বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তনশীল কারণ ও অবস্থার উপর নির্ভরশীল — যেমন চিন্তানায়কগণের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাহাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থা, তাহাদের মনোভাব ও আবেগের প্রবণতা ও চিন্তার বিষয়বস্তু। সন্দেহবাদীরা চপল ও চঞ্চল বলিয়া অবহেলিত হইয়াছেন এবং তাহাদের মতের প্রতি তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। অনেক সময়ে তাহাদিগকে বিপজ্জনক গন্য করা হয় বা কোন বিপদের সময় তাহারা নিগ্রহ ও উৎপীড়নের কবলে পতিত হয়। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এমন কি তাহারা— স্ক্রটাস, ব্রস্প্রীরাসাঁন, মণ্টাইন, হিউম — এই সকল সমস্যা ও প্রশ্নের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে কোন সন্দেহ পোষণ করেন নাই। এই সকল প্রশ্ন ও সমস্যাসমূহের চরম ও সুনিশ্চিত সমাধানের সম্ভাবনায় তাহাদের সন্দেহ ছিল।

ইহা অপেক্ষা আমূল কিছু করিবার ভার বিংশশতাব্দীর উপর পড়িয়াছে। প্রথমবারের মত জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে সেই সকল প্রশ্ন ও সমস্যা প্রত্যেক যুগের মৌলিক ও সাধু চিন্তানায়কদের বারে বারে অপ্রতিভ করিয়াছে ও যন্ত্রণা দিয়াছে, অন্তঃদৃষ্টি (একধরণের প্রহেলিকাময় দক্ষতা) এবং স্বজ্ঞার মাধ্যমে ইহাদের সমাধান করা যায় না; বরং প্রশ্ন ও সমস্যাসমূহকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত করিয়াই ইহাদের উত্তর বা সমাধান করা যায়। এই পদ্ধতির অর্থ ইহবে যুক্তিসংগত উপায়ে ইহাদের দূর করা নয়, বরং প্রমাণ করিতে হইবে যে এই সকল প্রশ্ন ও সমস্যা বুদ্ধি-সংক্রান্ত গোঁজামিল বা শব্দঝঙ্কার বা তথ্য সম্পর্কীয় ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আবার এই কথা প্রমাণ করিতে হইলে যুক্তিসংগত উপায়ে বিভিন্ন যুক্তিতর্কের অবতারণা করিতে হইবে। প্রশ্নকারীর প্রতি এমন ব্যবহার হইবে যাহাতে, যে সমস্যা এক সময়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং যাহার কোন সমাধান নাই বলিয়া মনে হইত, তাহা দুঃস্বপ্নের মত তাহার চেতনা হইতে অপসৃত হইবে এবং তাহাকে আর যন্ত্রণা দেবে না। ইহার মধ্যেই এই পদ্ধতির তাৎপর্য নিহিত। এই পদ্ধতির অর্থ এই নয় যে কোন বিশেষ সমস্যার উৎপত্তি, প্রাসঙ্গিকতা বা ভার বিষদ ব্যাখ্যা এবং যুক্তিসংগত তাৎপর্যকে বিকশিত হইতে দেওয়া বরং ইহার উদ্দেশ্য যে দৃষ্টিশক্তি হইতে এই ধরণের জিজ্ঞাসাবাদের উৎপত্তি হয় তাহাকে পরিবর্তিত করা। সে

যুগের এই সকল প্রখ্যাতনামা দার্শনিকগণ এই সকল সমস্যার বিশ্লেষণ করিয়া সমাধান দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মানব-জীবনে চলার পথে এই সকল সমস্যা বা প্রশ্নগুলি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক যুগেই সন্দেহবাদী লোক ছিল ও তাহাদের মতে এই সব সমস্যার কোন চূড়ান্ত ও শেষ সমাধান নাই। এই পর্যন্ত যে সকল সমাধান করা হইয়াছে, তাহা বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তনশীল কারণ ও অবস্থার উপর নির্ভরশীল — যেমন চিন্তানায়কগণের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাহাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থা, তাহাদের মনোভাব ও আবেগের প্রবণতা ও চিন্তার বিষয়বস্তু। সন্দেহবাদীরা চপল ও চঞ্চল বলিয়া অবহেলিত হইয়াছেন এবং তাহাদের মতের প্রতি তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। অনেক সময়ে তাহাদিগকে বিপজ্জনক গণ্য করা হয় বা কোন বিপদের সময় তাহারা নিগ্রহ ও উৎপীড়নের কবলে পতিত হয়। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এমন কি তাহারা— স্ক্যটাস, ত্রম্প্রীরাসাঁন, মণ্টাইন, হিউম — এই সকল সমস্যা ও প্রশ্নের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে কোন সন্দেহ পোষণ করেন নাই। এই সকল প্রশ্ন ও সমস্যাসমূহের চরম ও সুনিশ্চিত সমাধানের সম্ভাবনায় তাহাদের সন্দেহ ছিল।

ইহা অপেক্ষা আমূল কিছু করিবার ভার বিংশশতাব্দীর উপর পড়িয়াছে। প্রথমবারের মত জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে সেই সকল প্রশ্ন ও সমস্যা প্রত্যেক যুগের মৌলিক ও সাধু চিন্তানায়কদের বারে বারে অপ্রতিভ করিয়াছে ও যন্ত্রণা দিয়াছে, অন্তঃদৃষ্টি (একধরণের প্রহেলিকাময় দক্ষতা) এবং স্বজ্ঞার মাধ্যমে ইহাদের সমাধান করা যায় না ; বরং প্রশ্ন ও সমস্যাসমূহকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত করিয়াই ইহাদের উত্তর বা সমাধান করা যায়। এই পদ্ধতির অর্থ ইহবে যুক্তিসংগত উপায়ে ইহাদের দূর করা নয়, বরং প্রমাণ করিতে হইবে যে এই সকল প্রশ্ন ও সমস্যা বুদ্ধি-সংক্রান্ত গোঁজামিল বা শব্দঝঙ্কার বা তথ্য সম্পর্কীয় ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আবার এই কথা প্রমাণ করিতে হইলে যুক্তিসংগত উপায়ে বিভিন্ন যুক্তিতর্কের অবতারণা করিতে হইবে। প্রশ্নকারীর প্রতি এমন ব্যবহার হইবে যাহাতে, যে সমস্যা এক সময়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং যাহার কোন সমাধান নাই বলিয়া মনে হইত, তাহা দুঃস্বপ্নের মত তাহার চেতনা হইতে অপসৃত হইবে এবং তাহাকে আর যন্ত্রণা দেবে না। ইহার মধ্যেই এই পদ্ধতির তাৎপর্য নিহিত। এই পদ্ধতির অর্থ এই নয় যে কোন বিশেষ সমস্যার উৎপত্তি, প্রাসঙ্গিকতা বা ভার বিষদ ব্যাখ্যা এবং যুক্তিসংগত তাৎপর্যকে বিকশিত হইতে দেওয়া বরং ইহার উদ্দেশ্য যে দৃষ্টিশক্তি হইতে এই ধরণের জিজ্ঞাসাবাদের উৎপত্তি হয় তাহাকে পরিবর্তিত করা। সে

সকল সমস্যা বা প্রশ্নের সমাধানের বা মীমাংসার জন্য কোন মামুলি কলাকৌশল বা পদ্ধতি সহজে সৃষ্টি করা যায় না, ইহাদিগকে অতি সহজেই বদ্ধসংস্কার বা বাতিল বলিয়া গণ্য করা হয়; এবং ইহার কবল হইতে রোগীকে মুক্ত করিতে হইবে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, যদি কোন লোকের মনে সন্দেহ হয় যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যে বলপ্রয়োগ করে এই দুইয়ের মধ্যে কোন মিল নাই অথচ সে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য লালায়িত, তখন যথাযথ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাহাকে তার বদ্ধমূল সংস্কার হইতে মুক্ত করা সম্ভবপর হইতে পারে এবং তাহার এই আবেগ দূর হইয়া যাইবে আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে উদ্বিগ্ন বা বিচলিত প্রশ্নকারীকে তাহার ভার হইতে মুক্ত করা হইবে এবং তখনই সে সমাজের কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হইবে। তখন কোন প্রকারে চিত্তবিক্ষেপ ও উপদ্রব-প্রসূত চিন্তা তাহাকে বাধা দিবে না, কারণ ইহার কারণের মূলোৎপাটন করিয়া ইহাকে সরান হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে একটা প্রতিভা-প্রসূত সারল্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন উপায় ও পন্থা সম্পর্কীয় মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাবনাকে দূর করিয়া ইহা রাজনৈতিক-নীতিতে ঐক্য আনয়ণ করে। অথচ বিভিন্ন উপায়-সংক্রান্ত সম্ভাবনা অতীত ও পুরাতন সমাজব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। বিপ্লব ও বিপ্লব হইতে উদ্ভূত নূতন সমাজ-ব্যবস্থার ফলে ইহা অচল হইয়া পড়িয়াছে। এইভাবে সাম্যবাদী ও ফ্যাসীবাদী দল একটিমাত্র দলবিশিষ্ট সমাজ ও লৌকিক ও ধর্মীয় আদর্শ — রাজনৈতিক ও আদর্শ-ভিত্তিক সাদৃশ্য আরোপ করিতে সমর্থ হয়।

এই জন্য যেমন মার্ক্সের রচনাবলীকে প্রত্যক্ষভাবে দোষারোপ করা যায় না, তেমনি বর্তমান সময়ের জাতিধারাকেও দোষ দেওয়া যায় না, মীল বা কোঁতে বা ব্যাকলের ন্যায় মার্ক্সও ছিলেন ঊনবিংশশতাব্দীর একজন বিশেষ সামাজিক চিন্তাবিদ। অভিপ্রায়-মূলক মনস্তাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ তাহাদের নিকট যেমন অপরিচিত মার্ক্সের নিকটও তেমন অপরিচিত। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে তাহার পূর্ববর্তী চিন্তানায়কদের অনেক প্রশ্নই প্রকৃত ও যথাযথ এবং তিনি মনে করিতেন যে তিনি সেই সকল প্রশ্নের ও সমস্যার উত্তর ও সমাধানের সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহার সমাধানের সমর্থনে তিনি যে যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন, সে সম্পর্কে তিনি সরলভাবে মনে করিতেন যে ইহার সঙ্গে তাহার সমকালীন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রীতিনীতির মিল রহিয়াছে। তিনি যতখানি দাবী করেন প্রকৃতপক্ষে তাহার দৃষ্টিভঙ্গি ততখানি বৈজ্ঞানিক কি না বা তাহার সমাধান আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত

কিনা — তাহা অবশ্য অন্য প্রশ্ন। বাস্তবপক্ষে তিনি যে সকল প্রশ্ন ও সমস্যার মীমাংসা করিতে চাহিয়াছিলেন, ইহাদের বিশুদ্ধতাকে তিনি স্বীকার করিতেন। তিনি যে মতবাদের প্রস্তাব করিলেন তাহা প্রচলিত অর্থে বৈজ্ঞানিক বলিয়া দাবীকৃত এবং বহুবিধ উক্ত মতবাদ জটিল সমস্যার উপর প্রচুর আলোকপাত করিল ; আবার অন্যদিকে অনেক সমস্যাকে আরও মেঘাচ্ছন্ন বা দুর্বোধ্য করিয়া তুলিল। ইহার ফলে অনেক প্রশ্ন, সমস্যা ও সমাধানের পুনরায় ব্যাখ্যা ও মূল্যনির্ধারণ আরম্ভ হইল।

কিন্তু সাম্যবাদী রাষ্ট্রের এবং বিশেষ করিয়া ফ্যাসীবাদী রাষ্টের প্রচলিত রীতি হইতেছে নাগরিকদের বিশ্লেষণক্ষমতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জনের অনুরূপ শিক্ষিত না করা এবং তাহাদের বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি ও স্বজ্ঞার উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করা। এই ধরণের রাষ্ট্রে যুক্তিসংগত প্রশ্ন-উত্তর-পদ্ধতিকে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করা হয়, এমন সব বৈশিষ্ট্য লইয়া এই রীতি গঠিত যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যে কোন চিন্তানায়ক ইহাকে তীব্র ঘৃণা ও ভয়ের সঙ্গে দেখিবেন। এই রীতির স্বরূপ এমন ধরণের যে ইহাতে ব্যক্তিকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যেন কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাবাদ তাহাকে যন্ত্রণা দিতে না পারে—বিশেষ করিয়া যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত ও আলোচিত হইলে সমাজ ব্যবস্থার স্থীতিশীলতা বিপন্ন হইতে পারে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অতিকথা, জীবন ও চিন্তাধারার সমন্বয়ে শক্তিশালী কাঠামো গড়িয়া তোলা এই রীতির অপর একটি বৈশিষ্ট্য। এই কাঠামোর কাজ হইল এই রীতিকে হঠাৎ কোন প্রচণ্ড আঘাত বা মন্থরগতিতে বিলীন হওয়ার হাত হইতে রক্ষা করা। একটি মাত্র রাজনৈতিক দল লইয়া গঠিত ও সমগ্র জীবননিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী রাষ্ট্রের আদর্শের ক্রমবিকাশের সময়ে এই প্রকারের মননশীলতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। এই ধরণের আদর্শ হইতে এমন একটা মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাহাতে বিরক্তিজনক প্রশ্নসমূহ এক জাতীয় মানসিক উদ্বেগ হিসাবে দেখা দেয়। ইহা ব্যক্তিবিশেষের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অতীব ক্ষতিকর এবং ইহা ব্যপকভাবে আলোচিত হইলে সমাজের পক্ষেও অনিষ্টকর। ইহাই হইতেছে জর্জ অরওয়েলের ও আল্ডয়াস হাক্সলীর চুল-চেরা ও অতিসূক্ষ্ম বিদ্রুপাত্মক রচনার সারমর্ম। এই মনোভাবের ফলে সর্বপ্রকার আভ্যন্তরীণ কলহ বা দ্বন্দ্ব একটা আপদ বা একজাতীয় অর্থহীন আত্মপরাজয় বলিয়া মনে হয়। নৈতিক, ভাবোদ্দীপক, বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত দ্বন্দ্ব, কলহ বা সংঘর্ষ, বিশেষ ধরণের অতীব তীব্র আত্মিক মর্মযাতনা ; এবং ইহা যখন ভীষণ বেদনাদায়ক পরিস্থিতির আকার ধারন করে তখন এই অবস্থা হইতে উদ্ভূত হয় মানুষের চিন্তা ও কল্পনা, আবিষ্কার, দর্শন ও শিল্পকলার মহান সৃষ্টি ও অবদান — এইসব উক্ত

মনোভাবের নিকট সাংঘাতিক ও বিনাশকারী ব্যধি ছাড়া আর কিছুই নহে। যেমন স্নায়ুরোগ, মানসিক বিকৃতি, মানসিক বিশৃঙ্খলতা; এবং এই সকল মানসিক রোগের চিকিৎসা হওয়া আবশ্যক। ব্যক্তি ও সমাজ সুসংবদ্ধ, বেদনাহীন, তৃপ্ত ও স্বয়ংস্পষ্ট চিরস্থায়ী সাম্যবস্থায় অবস্থান করিতে হইলে সেই পথ ও পন্থা অনুসরণ ও অবলম্বন করিতে হইবে, এই সকল বিকার সেই পথ হইতে মারাত্মক বিচ্যুতির প্রতীক।

সত্যই ইহা এক সুদূর-প্রসারী ধারণা এবং প্লেটো, বা ম্যাকীয়াভেলী, স্যুইপ্ট বা কারলাইল-এর মত চিন্তানায়কদের দুঃখবাদ বা বৈরাগ্যবাদ অপেক্ষা ইহা অধিকতর শক্তিশালী। তাঁহাদের মতে অধিকাংশ মানুষই অপরিবর্তনীয়ভাবে নির্বোধ বা অসংশোধনীয়ভাবে লম্পট বা দুষ্ট এবং সেই জন্য তাঁহারা ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন কি করিয়া বিশ্বকে অসাধারণ, সুরুচিসম্পন্ন বা উচ্চশ্রেণীর সংখ্যালঘিষ্ঠ মানবসম্প্রদায় বা ব্যক্তির জন্য নিরাপদ করা যায়। কঠিন ও জটিল সমস্যার বাস্তবতাকে তাঁহারা স্বীকার করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ মানুষের এই সব সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা নাই। চরমপন্থীদের মতে বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার কারণ হইতেছে পেশা-সংক্রান্ত সমস্যা, এবং বাস্তবনীতির মারফতে ইহার সমাধান করিতে হইবে। অথবা ইহা এক ধরণের মানসিক পীড়া যাহার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন; অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে হইবে। ইহা হইতে উদ্ভূত হয় সত্য ও নিঃস্বার্থ আদর্শ সম্বন্ধে অভিনব ধারণা, এবং বিগত শতাব্দীর মানুষের নিকট ইহা কদাচিৎ বোধগম্য হইবে। এই ধরণের মতবাদ পোষণের অর্থ এই দাঁড়ায় যে বিশুদ্ধ পেশা-সংক্রান্ত পরিবেশের বাহিরে (যেখানে মানুষ শুধু উদ্দেশ্য সাধনের যোগ্যতম উপায় বা পন্থা খুঁজিয়া বেড়ায়) 'সত্য', 'ন্যায্য' বা 'স্বাধীন' এই সব পদ বা শব্দ এবং ইহারা যে ধারণার নির্দেশ করে — এই সকলের ব্যাখ্যা করিতে হইবে মূল্যবান হিসাবে স্বীকৃত একমাত্র কর্মশীলতার মাধ্যমে বা পরিভাষায়। অন্য কথায় সমাজ সংগঠন এইভাবে করা হয় যে বাঁচিয়া থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত মানুষের চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার ইহা এক অবাধ স্বক্রীয় যন্ত্রের মত কাজ করিয়া যায়। এই জাতীয় সমাজে, পদ, শব্দ ও আদর্শ নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গির রূপায়ণ এবং ইহাদের মধ্যে এইভাবে সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে যাহাতে তেমন কোন কলহ বা বিবাদ দেখা না দেয়। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি প্রাপ্ত সম্পদকে অধিক পরিমাণে কাজে প্রয়োগ করিতে পারে।

ইহাই ডষ্টয়ভস্কীর উপযোগবাদমূলক দুঃস্বপ্ন বা বিভীষিকা। সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে গিয়া মানবহিতৈষী উদারপন্থীরা অত্যাচার, অনাচার, অবিচার ও

অযোগ্যতা দেখিয়া নিদারুণভাবে অপমানিত হইলেন এবং অনুধাবন করিলেন যে এই সকল আপদকে রহিত করিবার সুষ্ঠু পদ্ধতি হইতেছে কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি বা আবেগের বিকাশের জন্য প্রচুর সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করা নয় বরং এইসব বিপদসংকুল উদ্দেশ্য সাধণের অভিপ্রায়কে দূর করা। ইহার জন্য আরও প্রয়োজন যে সব প্রবণতা হইতে সমালোচনা, অসন্তোষ ও নীতিহীন জীবনধারা উদ্ভূত হয় তাহাকে দমন করা। ইহার ঐতিহাসিকতা আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। যান্ত্রিক ও পেশা-সংক্রান্ত প্রগতি ও সামাজিক পরিবর্তনের গতি ও পরিমাপের মধ্যে বৈষম্য বা অসমতা — এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধনের কোন প্রকার নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভবপর নয়। অবশ্য এড্যামস্মীথ এই ব্যপারে অতীব আশাবাদী ছিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেক সংঘর্ষ ঘটিয়াছে এবং ফলে মারাত্মক ও আপাতদৃষ্টিতে অপরিহার্য অর্থ-নৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে। ইহার সঙ্গে দেখা দিয়াছে সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক বিপর্যয়, এবং সাধারণ সামাজিক কাঠামো (আচরণ, অভ্যাস, চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, ভাষা, এক কথায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের আদর্শের ভিত্তি) যাহা সহ্য বা বহন করিতে পারে নাই। ফলে প্রচলিত রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মপদ্ধতিতে মানুষ বিশ্বাস হারাইয়াছে এবং মরিয়া হইয়া এমন এক জগতের সন্ধান খোঁজে, ইহা যতই বিষণ্ন, বেদনাদায়ক ও বিরস হউক না কেন, যে জগতে অন্ততঃ মানুষ আকস্মিক বিপর্যয়ের কবল হইতে রক্ষা পাইবে। এই অবস্থার বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হইতেছে স্বাধীনতা, বা সাম্য বা সভ্যতা বা সত্য সম্পর্কে পুরাতন সংগ্রামের উদ্দেশ্যহীনতা ও অর্থশূন্যতায় মানুষকে জাগ্রত করা, কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে এই ধরণের যোগসূত্র ঊনবিংশশতাব্দীতে যেমন বোধগম্য মনে হইত, বর্তমানে আর তেমন হয় না।

এই অবস্থার সম্প্রসারণের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, ইহাকে আয়ত্ত করিবার একটা অনিচ্ছা দেখা দেয়। একদা পূজীত ও সম্মানিত ভাষার রূপ বা পদ্ধতি পরিহার করা হয়। এই সব ভাষার পদ্ধতিকে ইহাদের আসল মূল্য হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। নূতন নৈতিকতা সম্পর্কে বিভিন্ন ও মাঝে মাঝে ঠিক বিপরীত ধারণা প্রকাশ করার জন্য ইহাদের ব্যবহার করা হয় এবং পুরাতন মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বর্বরোচিত ও নীতিজ্ঞানশূন্য বলিয়া মনে হয়। শুধু ফ্যাসীবাদীরাই পুরাতন প্রতীকসমূহকে ধরিয়া রাখিবার ভান করে নাই। রক্ষণশীলপন্থী ও অসংযত ধরণের আধুনিক বড় ব্যবসায়ের প্রতিনিধিরা খানিকটা ঘৃণার সঙ্গে ও খানিকটা আশাপূর্ণভাবে স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র এই ধরণের শব্দ ব্যবহার করে। ফ্যাসীবাদীরা স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রকে সরাসরি নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘৃণাপূর্ণভাবে প্রত্যাখান করে এবং ইহাকে বাঁচিয়া

যাওয়া আদর্শের পুরাতন খোলস বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। বিশেষ ধরণের প্রতীক সমূহের ব্যবহার সম্বন্ধে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও নূতন রাজনৈতিক মনোভাবের বিবিধ ধরণের মধ্যে প্রকৃত সাদৃশ্য রহিয়াছে।

বর্তমানে এই অবস্থার সঙ্গে বিজড়িত বলিয়া আমরা ইহাকে পরিষ্কারভাবে দেখিতে পারি না। কিন্তু একবিংশশতাব্দীর পর্যবেক্ষকগণ অধিকতর সহজভাবে এই সব ধরণ বা নমুনার সাদৃশ্য দেখিতে পাইবে। আমরা যেমন রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের উন্নতি বা সরল প্রত্যক্ষবাদকে কৃষ্টি-সম্পন্ন উদারমনা স্বৈরতন্ত্র বা অভিজাত-প্রজাতন্ত্র হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে পারি, তেমনি আগামী শতাব্দীর পর্যবেক্ষকগণও এই সব ছাঁচের সাদৃশ্য সমূহকে তাহাদের অদূর বা নিকট অতীত হইতে পরিষ্কার ও স্বাভাবিক ভাবে পৃথক করিতে পারিবে। এমন কি যদিও আমরা ইহাদের সঙ্গে জড়িত, তবুও আমরা আমাদের সময়ের যে কোন অভিনব জিনিষকে সহজে বিচার করিয়া বুঝিতে পারি। এমন কি আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নূতন বৈশিষ্ট্য সমূহের বিকাশের ধারা উপলব্ধি করিতে পারি। একদিকে আমরা দেখিতে পাই সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের নিকট রাজনৈতিক স্বার্থের ক্রমবর্ধমান ও সচেতন বশ্যতা। এই বশ্যতার স্পষ্টতম লক্ষণ হইতেছে মানুষ পুঁজিপতি বা শ্রমিক হিসাবে নিজের আত্মপরিচয় ও সচেতন একতাকে প্রকাশ করে এবং যদি ধ্বংস করা না হয়, তবে তাহারা জাতীয় ও ধর্মীয় অনুরাগকে অতিক্রম করিয়া যায়। কাজে লাগাইবার মত অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন — এই প্রকারের দৃঢ় বিশ্বাস বাড়িয়া যাইতেছে। আবার রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইলেই মানুষ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করিতে পারে — এই ধরণের বিরোধী মতবাদকে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে অস্বীকার করা হয়। নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব বাড়িবেই এবং কমিবে না — এই ধরণের উক্তি এই মতবাদে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ইউরোপে শিল্পকারখানার মালিক ও সাধারণ মানুষ এই তত্ত্ব যতখানি বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করিয়াছে, মার্কীন যুক্তরাষ্ট্রে ততখানি হয় নাই। কিন্তু অধুনা আমেরিকাতেও যেই পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে ৫০ বৎসর দূরের কথা ৩০ বৎসর পূর্বেও তাহা কাল্পনিক বা অবাস্তব মনে হইত। এই বিরাট রূপান্তরের সঙ্গে আসিয়াছে প্রচুর আর্থিক লাভ। এবং অপেক্ষাকৃত কম অনুদার সমাজেও আসিয়াছে সত্যিকার সামাজিক সমতা। কিন্তু এই বিরাট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে এমন একটা কিছু যাহা এই সকলের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা হইতেছে মুক্ত জিজ্ঞাসাবাদ, প্রশ্ন ও সৃষ্টির প্রবণতার অপনয়ন বা বড় জোর অননুমোদন। বিংশশতাব্দীর দাবী হইতেছে যে এই প্রবৃত্তি আইন ও অপ্রচলিত ব্যবস্থাকে মানিয়া চলিবে। অথচ এই

অবস্থায় এই প্রবণতা তাহার স্বকীয় স্বরূপ না হারাইয়া পারে না। একশত বৎসর আগে অগাষ্ঠ কোর্থ প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে যদি অঙ্কশাস্ত্রে ভিন্ন মত পোষণ করিবার স্বাধীনতার দাবী ন্যায়ত না চলে, তবে নীতিশাস্ত্র বা সামাজিকজ্ঞানে এই ধরণের দাবীকে কেন ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করা ও উৎসাহ দেওয়া হইবে? ব্যক্তি বা সমগ্র সমাজের জন্য বিশেষ ধরণের আচরণ, গতি, চিন্তা ও ভাবের সৃষ্টিই যদি সামাজিক ও ব্যক্তিগত কর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে কোঁৎথের মত অখণ্ডনীয়। সমাজব্যবস্থা ও প্রচলিত রীতির, এমনকি সাধারণভাবে স্বীকৃত কর্মের উদ্দেশ্যের প্রভাব ও বৈধতাকে উপেক্ষা করিবার অধিকার হইতেই বুর্জোয়া কৃষ্টির গৌরব। ঊনবিংশশতাব্দীতে এই কৃষ্টি তাহার গৌরবের উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল। বর্তমানে আমরা ইহার চরম ফলের স্পষ্ট নিদর্শন লক্ষ্য করিতেছি।

যে মনোবৃত্তি হইতে বিরোধ ও দুঃখ-কষ্ট উদ্ভূত হয় ইহাকে নিস্তেজ করিয়া দ্বন্দ্ব ও দুঃখকে লাঘব করার নীতির উপর এই ধরণের মনোভাব প্রতিষ্ঠিত এবং এই জন্যই এই মনোভাব নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ কৌতুহলের প্রতি হয় শত্রুভাবাপন্ন বা অন্তত সন্দিগ্ধ। এবং সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয় এই ধরণের শিল্পকলা সম্পর্কীয় প্রচলিত নিয়মকে এক প্রকারের সামাজিক চাঞ্চল্য বলিয়া হেয় মনে করে। এই ধরণের বৃত্তি বা পেশা কোন সুস্পষ্ট বিপদের ইঙ্গিত না দিলেও এই মতবাদ অনুসারে বিরক্তিকর, অপব্যয়ী ও অপ্রাসঙ্গিক, নগণ্য ও অতীব কষ্টে সংগৃহীত শক্তি ও উদ্যমের অপচয় করে বা বিপথে চালিত করে। অথচ এই শক্তি ও উদ্যমকে সুসংগত ও অখণ্ড সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত করা উচিত। মনের এই অবস্থায় সত্য, সম্মান, দায়িত্ব বা সৌন্দর্য — এই সকল শব্দ বা প্রত্যয় স্বভাবত আক্রমণাত্মক বা আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রে রূপান্তরিত হয়; এবং নিজস্ব নিয়ন্ত্রণের বাহিরের প্রভাব হইতে মুক্ত সমাজ সৃষ্টির সংগ্রামে কোন রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক দল এই অস্ত্রের ব্যবহার করে। চিন্তাধারা ও চিন্তাধারার পদ্ধতির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিয়া এবং সমগ্র বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই ধরণের সম্প্রদায় সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন হইতে পারে — যে বিশ্বে মানুষ স্বাধীন অন্ততঃ এই অর্থে যে তাহারা যাহা ইচ্ছা করে তাহা ব্যক্ত করিতে পারে, যেখানে শব্দ বা বাক্য এখনও অপেক্ষাকৃত অনিয়ন্ত্রিত এবং ইহাতে সর্বপ্রকার বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভবও হইতে পারে। কঠোর নিয়ন্ত্রণের পরিধিকে বাড়াইয়া সমগ্র মানব সমাজের উপর (সর্বপ্রকার নৈরাষ্ট্রবাদী শক্তির উৎস) আরোপ করিলে এই ফল লাভ করা যাইবে। এই দুই উপায়ের যে কোন একটিকে অবলম্বন করিয়া এমন এক অবস্থার সৃষ্টি

করা যাইতে পারে যেখানে বিশেষ কলাকৌশল প্রয়োগে যোগ্য বিশেষজ্ঞগণের মতে অতি সহজেই মানুষের আচরণ অতি নিপুণতার সঙ্গে পরিচালিত করা যাইতে পারে। বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত এই ধরণের আবহাওয়া বিচারের মৌলিকতা, নৈতিক স্বাধীনতা ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কীয় অসাধারণ ক্ষমতা বিকাশের পক্ষে অনুকূল নহে। এই ব্যবস্থার গতি বা ঝোঁক হইতেছে সমগ্র সমস্যাসমূহকে কম বা বেশী জটিল পেশা-সংক্রান্ত সমস্যায় পরিণত করা। বিষেশত কি করিয়া বাঁচিতে হইবে, কি করিয়া সামঞ্জস্যহীনতা দূর করিতে হইবে, এবং এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে যেখানে ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক বা অর্থনৈতিক দক্ষতা ও ক্ষমতাকে সর্বাধিক নির্মল সামাজিক বিধানে নিয়োজিত করা হইবে। ইহার সফলতা নির্ভর করে একক সার্বিক (all-embracing, all-clacifying, all-satisfying) পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যক্তির মনের সংশয়, সন্দেহ ও দ্বিধাকে নিরোধ করার উপর।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে এই প্রবণতা কঠোর ও তীক্ষ্ণ রূপ ধারণ করিয়াছে। সেখানে আদর্শ ও ভাবতত্ত্বের অবিকল অনুপ্রেরণায় বিশ্বাস করিবার মত দক্ষতা সহকারে, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার নিকট বশ্যতা ও বিশৃঙ্খলা নাশকারী অবস্থার — শিক্ষা বা অবদমনের মারফতেই হউক — অপনয়নের কাজ সম্পন্ন করা হইয়াছে। তাহারা বিশ্বাস করেন যে, ভাবধারাকে সম্পূর্ণরূপে, কঠোরভাবে, ও তাড়াতাড়ী বাস্তবে রূপায়িত করিবার মত দক্ষতা মানুষের আছে এবং ইহা মানুষের কর্তব্য। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন সকল শ্রেণীর রুশীয় চিন্তানায়কগণ এই মতবাদ ও ভাবতত্ত্বের প্রতি অসাধারণভাবে আসক্ত। সোভিয়েট বিধিব্যবস্থা পরিষ্কার, সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রমাণিত প্রতিজ্ঞা হইতে সঠিকভাবে গৃহীত। এই ভাবতত্ত্বকে বাস্তবে পরিণত করিবার ভার দিতে হইবে ইহার প্রয়োগকৌশলে শিক্ষিত বিশ্বাসীদের উপর এবং এই বিশ্বাসীগণ তাহাদের নিয়ন্ত্রাণধীন মানুষকে একটা উপাদান বলিয়া গন্য করে এবং মনে করে যে এই উপাদান বিজ্ঞান নির্দেশিত সীমারেখার মধ্যে অন্তহীনভাবে নমনীয়। "সৃষ্টিধর্মী শিল্পী হইতেছেন মানব আত্মার এন্‌জিনিয়ার" — ষ্ট্যালীনের এই উক্তি এই জীবনী-শক্তির বা জীবন চেতনার যথাযথ অভিব্যক্তি। বিগত মহাযুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত ফ্যাসীবাদী সমাজে এই ধরণের জীবন চেতনা বিদ্যমান ছিল। বিজ্ঞানের পরিবর্তে সেখানে ছিল স্বজ্ঞা বা সহজাত আবেগ এবং কপটতার জায়গায় ছিল মানুষের শিল্প, সৌন্দর্য ও সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা। এই প্রবণতা পশ্চিম ইউরোপে অপেক্ষাকৃত শান্ত রূপ ধারন করিয়াছে। সেখানে রাজনৈতিক নীতি বা মতবাদ সম্পর্কীয় মতভেদের উপর জোর না দিয়া রাজনৈতিক পদ্ধতি সংক্রান্ত মতভেদের উপর জোর দেওয়া হয়। ন্যূনতম

অর্থনৈতিক বা সামাজিক স্থিতীশীলতা আনয়ণ করিবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় বা পন্থা সম্বন্ধীয় মতভেদের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই ন্যূনতম অর্থনৈতিক বা সামাজিক স্থায়িত্ব ব্যতিরেকে মৌলিক নীতি এবং জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কীয় যুক্তিতর্কের অবতারনা বস্তুনিরপেক্ষ, দুরূহ, নিছক তত্ত্বমূলক ও সময়ের জরুরী প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বলিয়া মনে করা হয়। পশ্চিম ইউরোপ আজ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা লইয়া নিত্যনৈমত্তিক অতীব ব্যস্ত। সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক সমস্যার প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহের অভাব তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে অনেক আমেরিকান ও বৃটিশ পর্যবেক্ষকগণ মর্মহত হন এবং ইহার নিন্দা করেন। তাহাদের মতে ইহার জন্য দায়ী মানুষের শিল্পসৌন্দর্য সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণাসুলভ মতবাদ ও আদর্শ-বিচ্যুতি। অবশ্য তাহাদের এই ধারণাও ভুল।

নূতন মূল্য বা মানের জন্য পুরাতন মূল্য বা মানের পরিহার, প্রাচীন পন্থার জীবিত সমর্থকদের নিকট (নৈতিকতার প্রতি) বিবেকবিবর্জিত অবজ্ঞা বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ইহা একটা বিরাট প্রবঞ্চনা মাত্র। বিবেকশূন্যই হউক বা উদাসীন হউক নূতন মানের প্রতি প্রকৃতপক্ষে তেমন বেশী অবিশ্বাস নাই। পক্ষান্তরে অযৌক্তিক বিশ্বাস ও সন্দেহবাদের প্রতি অন্ধ অসহিষ্ণুতার সহিত মানুষ এই নূতন মানকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। সন্দেহবাদের প্রতি এই অন্ধ অধৈর্যের উদ্ভব হয় নিগূঢ় আভ্যন্তরীণ দেউলিয়া হইতে। অন্যকথায় আশা নাই তবুও মানুষ আশা করে যে একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থল আছে, তাহা যতই সংকীর্ণ, অন্ধকার, বিচ্ছিন্ন হউকনা কেন তবুও নিরাপদ। জীবনের বৃহৎ অংশকে নিয়ন্ত্রিত হইতে দিয়াও যাহারা এই নিরাপত্তা বোধ চায়, তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে। স্বজ্ঞানে হউক আর নাই হউক নিয়ন্ত্রণকারীরা রীতিবদ্ধ ভাবে মানুষের কর্মশীলতার দিগন্তকে সংকুচিত করে এবং মানুষকে একটা সম্পূর্ণ অখণ্ড ছাঁচের সংযোগশীল অংশে পরিণত করিতে প্রয়াস পায়। নিরাপত্তার এই উদগ্র ইচ্ছার সম্মুখে পুরাতন সমস্ত রাজনৈতিক প্রীতি ও আদর্শ উবিরা যায়। পুরাতন মতবাদের দুর্বল প্রতীক নূতন বাস্তবতার সঙ্গে সুসংগত নহে।

এই কার্যধারার গতিভঙ্গি সর্বত্র একই রূপ নয়। সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক কারণে সম্ভবতঃ মার্কীন যুক্তরাষ্ট্রে ঊনবিংশশতাব্দীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও মতবাদ অন্য যে কোন দেশের অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশীল ও শক্তিশালী। যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত রাজনৈতিক সমস্যা ও দ্বন্দ্ব, আলোচনার বিষয়বস্তু ও গণতান্ত্রিক নেতাদের আদর্শরূপে কল্পিত ব্যক্তিত্বের কথা ভাবিলে ভিক্টোরিয়ান যুগের ইউরোপের কথা মনে পড়িয়া যায়। বর্তমানে ইউরোপে ইহা আর তেমন দেখা যায় না।

উড্রউইলসন্ ছিলেন ঊনবিংশশতাব্দীর একজন প্রকৃত উদারপন্থী। গ্ল্যাডষ্টোন, থয়ো জর্জ বা ফরাসীদেশের ধর্মযাজক বিরোধী গবর্ণমেণ্টকে কেন্দ্র করিয়া যে ধরণের রাজনৈতিক ঝড় বহিয়াছিল নূতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (New Deal) এবং পরলোকগত রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের ব্যক্তিত্ব সেই ধরণের রাজনৈতিক ভাবাবেগের উদ্রেক করে। এই ধরণের রাজনৈতিক ভাবাবেগ ইউরোপে আজ আর তেমন দেখা যায় না। এই মহান উদারনৈতিক প্রচেষ্টা ও উদ্যম (ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গঠনমূলক আপোস বা সমন্বয়)-এর সঙ্গে জন ষ্টুয়ার্ট, মীলের মানবহিতৈষী সমাজতন্ত্রী পর্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদের্শের বেশ গভীর মিল রহিয়াছে। ১৯৩০ সালে ইউরোপে প্রচলিত বামপন্থী চিন্তাধারার সহিত ইহার তেমন কোন মিল নাই। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, জাতিসঙ্ঘ ও তাহার সহকারী প্রতিষ্ঠান, যুদ্ধোত্তর অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যে তর্কবিতর্ক উঠিয়াছে তাঁহার সহিত ১৯১৮ সালের পরে জাতিসঙ্ঘকে কেন্দ্র করিয়া যে তর্ক উঠিয়াছিল এই দুইয়ের মধ্যে অনেক সংগতি রহিয়াছে। ঊনবিংশশতাব্দীর রাজনৈতিক ভাবধারার পরিপ্রেক্ষিতে এই তর্কবিতর্ক বেশ বোধগম্য। ইউরোপ অপেক্ষা মার্কীন যুক্তরাষ্ট্রে ইহা বেশী মনযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র হয়ত রাষ্ট্রপতি উইলসন্‌কে ভুলিয়া গিয়াছে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে যে নৈতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিরাজ করিতেছে তাহা উইলসনের সময়ে প্রচলিত অবস্থা হইতে তেমন বেশী তফাৎ নয়। ইহার সঙ্গে ভিক্টোরিয়া যুগের মূল্যবোধ প্রসূত নৈতিক জগতের মিল রহিয়াছে এবং ইহা সহজেই অনুমেয়। ১৯১৮ সালের ঘটনা প্রায় পচিশ বৎসর ধরিয়া আমেরিকানদের নীতিজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল অথচ ইউরোপে ইহার কোন গন্ধও আজ আর তেমন পাওয়া যায়না। অতীতের দিকে দৃষ্টি দিলে মনে হয় যেন এই মহান ঐতিহ্য ইউরোপ অপেক্ষা আমেরিকাতে বেশী কদর ও সম্মান পাইয়াছে। এই ফাটল হঠাৎ হয় নাই বা ইহা নাটকীয় নহে। অষ্টাদশ বা ঊনবিংশশতাব্দীতে যে বীজ বপন করা হইয়াছিল, বিংশশতাব্দীতে তাহা ফলপ্রসূ হইয়াছে। জার্মানী বা ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সে যে রাজনৈতিক ও নৈতিক অবস্থার মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম হইয়াছে তাহার মধ্যে রহিয়াছে মানুষের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে পুরাতন চিরপরিচিত মতবাদ। উদারনৈতিক ও মানবহিতৈষী মতবাদের শান্তিপূর্ণ প্রগতির যুগে প্রায় সকল রাজনৈতিক দল ও মত ইহাতে বিশ্বাস করিত। ঊনবিংশশতাব্দীর প্রধান চিন্তাধারা বর্তমানে টিকিয়াছে, বিশেষত আমেরিকাও কমনওয়েল্‌থ দেশসমূহে। অবশ্য ইহা বর্তমান যুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়, অতীতেও ভাবের সঙ্গে ভাবের সংঘাত হইয়াছে। এক শ্রেণীর ভাবধারা সঙ্গে অন্য শ্রেণীর

ভাবধারার সংঘর্ষ বর্তমান সময়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়; বরং সর্বপ্রকার ভাবধারার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বিরোধিতার প্রবল তরঙ্গই হইতেছে বর্তমান সময়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ভাবধারাকেই মনে করা হয় অশান্তি বা উৎকণ্ঠার প্রধান উৎস। ব্যক্তির রাজনৈতিক অধিকারের জন্য উদারপন্থীদের দাবী এবং তাহা হইতে উদ্ভূত অর্থনৈতিক অবিচারের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্ব ইহাকে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিবর্জিত শাসন প্রণালীর মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দমন করিতে সচেষ্ট হয়। যে স্বাধীন পরিবেশে এই ধরণের দ্বন্দ্ব সম্ভবপর হয়, এই শাসন প্রণালীতে তাহার কোন স্থান নাই। বর্তমান সময়ের সত্যিকার প্রতিরূপ হইতেছে সমাজ সম্বন্ধে নূতন ধারণা। এই সমাজের মূল্যবোধ ব্যক্তিবিশেষের মৌলিক উদ্দেশ্য প্রসূত ইচ্ছা বা নীতিবোধ হইতে উদ্ভাবিত হয় না বরং তথ্যপূর্ণ অনুমান বা ইতিহাস, জাতি বা জাতীয় চরিত্র সম্পর্কীয় আধিবিদ্যক মতবাদ হইতে উদ্ভূত; এবং ইহাদের মারফতেই কোনটা ভাল, ন্যায়, প্রয়োজনীয়, বাঞ্ছনীয় ও যোগ্য, বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে তাহার উত্তর খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভবপর হয় বা বিভিন্নধরণের আচরণে তাহা প্রকাশ পায়। একটা বিশেষ সংখ্যক ব্যক্তি একটি মাত্র পথে পরিচালিত হয় বলিয়া অনুমিত হয়; এবং সেই পথে তাহারা ধাবিত হয় আধা-সচেতন-নৈর্ব্যক্তিক শক্তির সাহায্যে, যেমন শ্রেণী ব্যবস্থা, তাহাদের অজ্ঞাত সত্ত্বা, জাতীয় উৎপত্তি ও পুরাণ বিজ্ঞান দ্বারা, পরিচালিত হয়। আচরণের উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া এই গতিপথের পরিবর্তন সাধন করা যায়। যাহারা অন্যায়ভাবে ইহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে চায় তাহারা নিজেদের ও অন্যের গতিপথ স্বাধীনভাবে নির্দেশ করিতে পারে। তবে এই জন্য তাহাদের সামাজিক আচার প্রণালী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং ইহার পরিচালনার জন্য বিশেষ দক্ষতা থাকাও আবশ্যক।

এই ধরণের অশুভ আকারেই স্যাণ্ট সাইমনের ভবিষ্যদ্বাণী অবশেষে সত্যে পরিণত হইয়াছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী অতীব সাহসপূর্ণ ও আশাবাদী বলিয়া মনে হইয়াছিল। স্যাণ্ট সাইমন বলিয়াছিলেন: "মানুষ পরিচালিত শাসন প্রণালী বস্তু-পরিচালিত শাসন প্রণালীতে রূপান্তরিত হইবে।" ("The Government of man will be replaced by the adminstration of things") মহাজাগতিক শক্তিকে সর্বশক্তিমান ও অবিনশ্বর বলিয়া মনে হয়। আশা, ভয়, প্রার্থনা দ্বারা তাহার অস্তিত্বের বিলোপ করা যায় না। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যাহারা সেরা তাহারা এই শক্তিকে কিছুটা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। এই বিশেষজ্ঞদের কাজ হইতেছে মানুষ ও মহাজাগতিক শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, মানুষের মনে নূতন সমাজ ব্যবস্থার

প্রতি অটল বিশ্বাস ও প্রশ্নাতীত অনুরাগ জন্মানো ; এবং তখনই এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হইবে। কাজেই পেশা সংক্রান্ত শিক্ষণীয় বিষয় যাহা প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে ও নূতন ব্যবস্থা ও মানুষের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে ; এবং তাহা মানবীয় পেশার (যেমন দর্শন ইতিহাস ও শিল্প) উপর প্রাধান্য বিস্তার করিবেই। এই ধরণের যান্ত্রিক পেশা নূতন ব্যবস্থাকে সমর্থন ও সুশোভিত করিবে। টুর্গেনীভের নাটক "Father and Sons"র প্রধান নায়ক অকপট জড়বাদী ও চরম বিপ্লবী বাজারব অবশেষে তাহার স্বকীয় মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্যাণ্ট সাইমন ও তাঁহার নীরস অনুগামী কোঁতে এই ব্যাপারে সব সময়ে নিশ্চিত ছিলেন, যাহা একশত বৎসর পূর্বে আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসংগত বলিয়া মনে হইত, তাহা হইতে ভিন্ন। বাজারবের বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল যে ভেঁকের শব-ব্যবচ্ছেদ করা, কাব্য চর্চা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজ, কারণ ইহাতে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু পুশ্‌কিনের কাব্যালোচনা হইতে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

বর্তমানে ইহার জন্য যে কারণ দর্শানো হয়, তাহা অধিকতর ভয়াবহ। শরীর-ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যাকে শিল্পকলা হইতে উচ্চস্তরের মনে করা হয়, কারণ ইহা হইতে জীবন-সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কোন উদ্দেশ্য উদ্ভব হয় না বা এমন কোন অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয় না যাহাকে ভালমন্দ, সত্য-অসত্য বিচারের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এই মতবাদ ও প্রচলিত নিষ্ঠা বা ব্যবস্থার মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। প্রচলিত নিষ্ঠা ও ব্যবস্থা মানুষ তৈয়ার করিয়াছে সন্দেহ, ভয়, নৈরাশ্য ও সামঞ্জস্যহীনতা-জনিত ভয়াবহ অবস্থা হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার দুর্গ হিসাবে। আবেগ বা বোধশক্তির তাড়নায় এদিক সেদিক বিভক্ত হওয়াও এক প্রকারের ব্যধি। ইহার বিরুদ্ধে কিছুই কার্যকরী হইবে না। একমাত্র পথ হইতেছে বিভিন্ন উপায় বা পন্থা সমূহকে প্রায় সমানভবে দূরিভূত করিতে পারিলে তাহাদের মধ্য হইতে মানুষের পক্ষে একটা পথ মনোনয়ন করিয়া নেওয়া সম্ভবপর হইতে পারে।

ডষ্টয়্যাভস্কীর "Brothers Karamazov"-এর শ্রেষ্ঠ তদন্তকারী (Grand Inquisitor) এই মতবাদকে মারাত্মক বাগ্মিতার সঙ্গে সমর্থন করে। মানুষ যাহাকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় করে তাহা হইতেছে পছন্দ বা মনোনয়ন করিবার স্বাধীনতা ও অন্ধকারে হাতড়াইয়া পথ অনুসন্ধান করার অবস্থা। রাজকীয় কর্তৃপক্ষ মানুষের স্কন্ধ হইতে এই গুরুদায়িত্ব উঠাইয়া নিয়া মানুষকে সম্মত, কৃতজ্ঞ ও সুখী ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছে। মহান তদন্তকারীর উদ্দেশ্য ছিল জীবন-চেতনায় সজীব এবং জীবনযাত্রার যুক্তিহীন ব্যবস্থা করা। তত্ত্বের দিক হইতে বাজারব

ইহার বিরোধী ছিল। বাজারব ছিল মুক্ত, স্বাধীন ও বৈজ্ঞানিক তদন্ত, কঠোর নির্মম তথ্যকে স্বীকার ও (যতই নির্দয় হউকনা) সত্যকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম পরিহাসের ফলে আজ তাহারা মহান (মহান তদন্তকারী ও বাজারব) এক চুক্তিতে আবদ্ধ, তাহারা পরস্পরের মিত্র ও তাহাদের মধ্যে আজ আর তেমন কোন পার্থক্য নাই। দার্শনিক ব্যুরিড্যানের যুক্তিতর্কে বিশ্বাসী গর্দভ, সমদূরে অবস্থিত দুই আঁটি খড়ের কোন একটিকে পছন্দ করিতে না পারায় অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই নিয়তির একমাত্র পরিণতি হইতেছে অন্ধ বশ্যতা ও বিশ্বাস। আমাদের দেশের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বলা হয় যে বিশ্বাসে ভগবান মিলে তর্কে নয়। আশ্রয়স্থল কি যুক্তিহীন ধর্ম বা যুক্তিহীন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তাহাতে তেমন কিছু আসে যায় না। কারণ এই ধরণের বাধ্যতা, বশ্যতা ও বিশ্বাস ব্যতিরেকে কোন দৃঢ় প্রত্যয় নাই ও কোন আশাভরসা নাই, এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে কোন প্রকার আশাবাদী, গঠনমূলক ও নিশ্চিত সমাধান নাই।

এখন হয়ত এই কথা বলা যায়, যে অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। এখানে প্রশ্ন করা যায় যে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনতা বিবর্জিত প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেক অযৌক্তিক আন্দোলন কি এই ধরণের কোন কোন বিষয়ে নিয়োজিত ছিল না — যেমন সন্দেহের কৃত্রিম নিস্তব্ধতা, অস্বচ্ছন্দ বা অপ্রীতিকর প্রশ্নকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা বা যাহাতে মানুষ এই ধরণের প্রশ্ন উত্থাপন না করে সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া? ইহা কি সুসংগঠিত বিরাট যাজক কর্তৃপক্ষের রীতি ছিল না? ইহা কি জাতীয় রাষ্ট্রের মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রথা ছিল না? অতীন্দ্রিয়বাদ হইতে আরম্ভ করিয়া রোমান্টিকবাদ, নৈরাষ্ট্রীয় বিপ্লববাদ, অধিবাস্তববাদ, বিগত দেড়শত বৎসর ধরিয়া এই সব কি বিচার-বিবেচনা ও যুক্তিবাদের শত্রুদের মনোভাব ছিল না? বর্তমান যুগকে কেন অপবাদ দেওয়া হয় যে ইহা কোন এক বিশেষ প্রবণতার প্রতি আসক্ত যাহা প্লেটোর সামাজিক মতবাদের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু বা মধ্যযুগীয় হত্যাকারীদের মতবাদ বা প্রাচ্য চিন্তাধারা ও অতীন্দ্রিয়বাদের প্রধান বিষয়বস্তু?

দুইটি প্রধান পার্থক্য আমাদের যুগের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে ইহাদের আদিরূপ হইতে পৃথক করিয়া দেয়। প্রথমতঃ, পূর্ববর্তীযুগের প্রতিক্রীয়াশীল বা রোমান্টিকগণ প্রতিষ্ঠানগত কর্তৃপক্ষের উচ্চশ্রেণীর অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতাকে সমর্থন করিলেও বা দৈবলব্ধ প্রত্যাদেশকে ব্যক্তির বিচারবুদ্ধির উপর প্রাধান্য দিলেও, তাহাদের চরম অযৌক্তিক মুহূর্তেও যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে তাহার গুরুত্বকে কমাইবার চেষ্টা

করে নাই। পক্ষান্তরে তাহারা মনে করিত যে সঠিক উত্তর বা সমাধান পাওয়া এতই গুরুত্বপূর্ণ যে একমাত্র পবিত্র ও প্রধান প্রতিষ্ঠান, বা অনুপ্রাণিত নেতা, বা দৈবলব্ধবাণী বা ঐশ্বরিক মহিমাই অতীব গভীর ও সার্বিক সমাধান দিতে পারে। যে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থায় প্রশ্নসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্বকে ক্রমোচ্চ শ্রেণীভাগে সাজান হয় এবং এই শ্রেণীবিভাগের কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা যায় না। অধিকন্তু যে সব উত্তর বা সমাধান দেওয়া হয় তাহাদের কোন কোনটির দুর্বোধ্যতা প্রত্যেক যুগেই তাহারা তাহাদের সত্যের স্বরূপের (বা যে সব প্রশ্নের বা সমস্যার তাহারা সমাধান করিতে চায় তাহার) সঙ্গে তাহাদের অপ্রাসঙ্গিকতাকে লুকাইয়া রাখে। তাহাদেরকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী অধিক কাপট্যের আবশ্যক। কিন্তু কাপট্য, বিশ্ব নিন্দাবাদ ও বিচারবুদ্ধি হীনতা হইতে পৃথক বা ভিন্ন। প্রাপ্তিসাধ্য সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে প্রধান সমস্যাসমূহের প্রকৃত সমাধান খুঁজিয়া বাহির করা বা পাওয়ার গুরুত্বের প্রতি, এমনকি মতামতের বিরুদ্ধ সমালোচকগণ ও সত্যের শত্রুরাও, বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শন করিতে বাধ্য হয়। যদি তাহাদের কর্ম ও রীতি ইহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে, (অন্তত মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার মত একটা কিছু আছে) তাহা হইলে বিশ্বাসঘাতকগণ ও প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী ব্যক্তিগণ সে বিশ্বাসকে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক পরিত্যাগ করিতে চাহে, এবং তাহার স্মৃতি ও কর্তৃত্বকে প্রায়ই জীবিত রাখে।

দ্বিতীয় পার্থক্য হইতেছে যে অতীতে সমস্যার প্রকৃত স্বরূপকে মেঘাচ্ছন্ন করার প্রচেষ্টা বিচারবুদ্ধি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বীকৃত ও বিঘোষিত শত্রুদের কাজ বলিয়াই বিশেষভাবে পরিগণিত হইত। রেঁনেসার যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন মতবাদ ও শক্তির বিন্যাস-ব্যবস্থা অতীব পরিষ্কার রহিয়াছে। প্রগতি ও প্রগতিবিরোধী মতবাদ ও শক্তি, যতই এই সকল শব্দের অপব্যবহার হউকনা কেন, এই সব ধারণা অর্থহীন বা প্রত্যয় সিদ্ধ নহে। একপক্ষে ছিল বিধিসংগত ক্ষমতা ও বিচারবুদ্ধিহীন বিশ্বাসের সমর্থকগণ যাহারা সত্যের অনিয়ন্ত্রিত অনুসরণ বা ব্যক্তিগত আদর্শের স্বাধীনভাবে বাস্তবে রূপায়ণ সম্পর্কে সান্দিহান ছিল বা খোলাখুলি ভাবে ইহার বিরোধিতা করিত; অপরপক্ষে ছিল মুক্ত ও স্বাধীন তদন্ত ও আত্মপ্রকাশের সমর্থকগণ যাহারা ভল্‌টেয়ার ও ল্যাসীং, মীল ও ডার্‌উহন ও ইব্‌সেনকে ঐশ্বরিক আদেশ-প্রাপ্ত নেতা হিসাবে গণ্য করিত। ইহাদের মধ্যে যে স্বাভাবিক ও সহজাত বৈশিষ্ট্যমূলক গুণ বা ধর্ম দেখা যায় তাহা হইতেছে রেঁনেসার আদর্শের প্রতি অনুরাগ ও মধ্যযুগের সঙ্গে জড়িত সবকিছুর প্রতি (ন্যায়ভাবে হউক বা না হউক)

ঘৃণা বিদ্বেষ — যেমন অন্ধকার, অজ্ঞতা, দমননীতি, প্রচলিত মতের বিরোধী মতবাদের দমন, আমোদ-প্রমোদ ও বীভৎস আচরণের প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি বিদ্বেষ। অবশ্য তাহাদের মধ্যে এমন অনেকে রহিয়াছেন যাহাদিগকে অত সহজে বা স্থূলভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় না। বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সকল মহাপুরুষ তাঁহাদের যুগের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহাদের সামাজিক পদ-মর্যাদা পরিষ্কার ভাবে নির্ণয় করিবার জন্য চিন্তাধারার গতিপথকে অতীব সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত করা হয়। বিজ্ঞানসম্মত নীতির প্রতি অনুরাগের সঙ্গে সংস্কৃতি-সংস্কারের প্রসারের বিরোধী সামাজিক মতবাদের সংযোজনা অচিন্ত্যনীয় বলিয়া মনে হইত। কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে এবং কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায় না, কিসে বিশ্বাস করিতে হইবে এবং কিসে হইবে না, তাহার পরিসর নির্ণয় করা, অবরোধ ও সীমাবদ্ধ করার প্রবণতা আজ আর প্রতিক্রীয়াশীলদের বিশিষ্ট লক্ষণ নয়। ঊনবিংশশতাব্দীর চরমপন্থী, যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীলদের উত্তরাধিকারীরা এই ব্যাপারে যেমন শক্তিমান তাহাদের শত্রুদের বংশধরেরাও তেমন সবল। শুধু যে বিজ্ঞানের উৎপীড়ন হইতেছে তাহা নহে, বরং বিজ্ঞানের মারফতে ও বিজ্ঞানের নামেই এই উৎপীড়ন চলিতেছে। কোন পক্ষেরই ক্যাসাণ্ড্রা সদৃশ নেতাগণ এই বিভীষিকা সম্পর্ক পূর্ব হইতে কিছু বুঝিতে বা অনুমান করিতে পারেন নাই।

প্রায়ই অভিযোগ করা হয় যে বর্তমান যুগ হইতেছে বিশ্বনিন্দাবাদ ও নৈরাশ্য-বাদ, পতন্মুখ মূল্যবোধ ও আমাদের সভ্যতার নির্দিষ্ট মানদণ্ড ও বৈশিষ্ট্যের শিথিলতার যুগ। কিন্তু ইহা সত্য নয় বা আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সংগতও নয়। ভাঙ্গিয়া পড়া সমাজ ব্যবস্থার শ্লথ গঠন রীতির কোন নমুনা তো দেখা যায়ই না বরং বিশ্ব আজ বিভিন্ন ধরণের অনমনীয় নিয়ম ও সংহিত এবং উদ্দীপনাময় যুক্তিহীন ধর্মে পরিপূর্ণ। কোন প্রকার সহিষ্ণুতা প্রদর্শন না করিয়া, যাহা পুরাতন বিধানের প্রতি ঘৃণাপূর্ণ অবজ্ঞা হইতে উদ্ভূত হয় বর্তমান জগতে প্রচলিত মতবাদের বিরোধী মতবাদকে চূড়ান্ত বিপদ বলিয়া মনে করা হয়। প্রাচ্য দেশে বা পাশ্চাত্যদেশে অন্ধ বিশ্বাসের যুগেও এতবড় বিপদ আর দেখা যায় নাই। অতীতের চাইতে বর্তমানে অধিকতর ব্যকুলভাবে বশ্যতার দাবী করা হইতেছে; চলিতেছে আনুগত্যের অধিকতর কঠোর পরীক্ষা। সন্দেহবাদী, উদারপন্থী, ব্যক্তিগত জীবন ও তাহাদের নিজস্ব আচরণের মানদণ্ডে রুচিবান এই ধরণের ব্যক্তি — তাহারা যদি কোন একটা সংঙ্ঘবদ্ধ বিশ্বাস বা মতবাদের সঙ্গে নিজেদের অঙ্গীভূত করিতে যত্নবান না হয়, তবে তাহারা হইবে ভয় ও পরিহাসের পাত্র, এবং তাহারা যে কোন পক্ষের উৎপীড়নের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে পরিগণিত হইবে।

বর্তমান সময়ের আদর্শ ভিত্তিক সংগ্রামে যুদ্ধরত সকল দলই তাহাদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখিবে। ঐতিহ্যগতভাবে যে সকল সমাজ চরমপন্থার প্রতি পরান্মুখ, সেখানে এই অবস্থা তেমন প্রকট নয়। আজ বিশ্বে ব্যক্তির মূঢ়তা ও পাপাচারকে ক্ষমা করা হয় অধিকতর সহজভাবে, কিন্তু ক্ষমা করা হয় না কোন অনুমোদিত ও স্বীকৃত দলের বা মতের সঙ্গে নিজকে অঙ্গীভূত করার ও অনুমোদিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বা বুদ্ধিগত পদমর্যাদা অর্জনের ব্যর্থতাকে। আগেকার যুগে যেমন এক-দিকে শাসকগোষ্ঠি মানুষের উপর শাসনদণ্ড পরিচালনা করিত, আবার মানুষও তেমন যে কোন বিরোধী শিবিরে আশ্রয় নিয়া শাসনদণ্ডের গুরুভার এড়াইতে পারিত। কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংগ্রামের ফলে সংকীর্ণ ও পরিবর্তনশীল, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অবর্তমান নয়, এমন একটি স্বাধীন পরিসর বা জায়গা ছিল যেখানে বিপজ্জনকভাবে ব্যক্তিগত জীবন যাপন সম্ভব ছিল কারণ কোন পক্ষই বেশীদূর যাইতে সাহস করিত না এই ভয়ে যে, যদি আবার তাহাতে প্রতিপক্ষ বেশী শক্তিশালী হইয়া পড়ে। আজ পিতৃ-সুলভমনোভাব সম্পন্ন সকল বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হইতেছে দারিদ্র্য, রোগ, ও অসাম্য দূর করার জন্য সত্যকার উৎকণ্ঠা, প্রকাশ, জীবনের অবহেলিত সকল ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতা বিধান এবং এই সকল উপকারী কর্মে ইহার সাফল্য বাঞ্ছা। এই সকল বৈশিষ্ট্য ও কর্তব্যবুদ্ধি ব্যক্তিগত ভুলের উর্ধে নহে, সেইজন্য অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির মঙ্গল, মন ও দেহের সুস্থতা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, অভাব ও ভয় হইতে স্বাধীনতার নামে তাহার স্বাধীনতাকে খর্ব বা হ্রাস করিয়াছে। ব্যক্তির মনোয়নের পরিসর দিন দিন ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছে এবং কোন বিরোধী নীতির নামে ইহা ঘটে নাই যেমন ঘটিয়াছিল অন্ধকার যুগে ও জাতীয়তাবাদের উৎপত্তির সময়ে। কিন্তু মনোয়নের পরিসরকে সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করিতে যেখানে বিরুদ্ধনীতির মানসিক যন্ত্রণা ও বিপদ এবং মারাত্মক সংঘাতের কারণ ও সম্ভাবনাকে দূর করিয়া সহজতর ও অধিকতর সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা ও দক্ষতার সঙ্গে কার্যকর ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য নিয়োজিত থাকিতে পারে। এবং এই ধরণের ব্যবস্থা ও অবস্থা বেদনাদায়ক এমন কি নৈতিক দ্বন্দ্বেও উদ্বেগহীন।

অকারণে ইহার এই পরিণতি ঘটে নাই। মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও যান্ত্রিক প্রগতির ফলাফল এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের শক্তির মধ্যে সমন্বয়সাধনের ব্যর্থতা — এই দুই কারণেই বিশৃঙ্খলা ও দারিদ্র্য নিবারণ করিবার জন্য অধিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হইয়াছে। এবং এই অন্ধ-বাধ্যতা অপেক্ষা ইহা মানুষের প্রগতির পক্ষে কম ক্ষতিজনক নহে। নীতিগতভাবে

ইহা নিশ্চয়ই অচিন্ত্যনীয় যে আমরা আমাদের সামাজিক লাভ ও সুবিধাকে বিসর্জন দেবো এবং পুরাতন অবিচার ও অসাম্য, নিরাশা ও দুর্বিপাকে ফিরিয়া যাইবার সম্ভাবনা সম্পর্কে মুহূর্তের জন্য চিন্তা করিব। বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও শিল্পবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় দক্ষতার উৎকর্ষের ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিকল্পনা যুক্তিসংগত ও জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। পরিকল্পনাকারীরা বিশেষ পরিকল্পিত সমাজ-ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অতীব অধীর এবং সেইজন্য যে বিপজ্জনক শক্তি তাহাদের পরিকল্পনাকে বিপন্ন করিতে পারে তাহা হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চায়। ইহাই "স্বয়ংসম্পূর্ণতা" ও "একদেশে সাম্যবাদ" বিস্তারের পক্ষে অতীব শক্তিশালী উদ্দীপনা। রক্ষণশীলপন্থী, বা নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনকারী বা স্বাতন্ত্র্যবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী যে কেহই এই অবস্থা আরোপ করুক না কেন, ইহার ফলে কৃত্রিম বাধার সৃষ্টি হয় এবং পরিকল্পনাকারীদের সম্পদ ক্রমশঃ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। চরম অবস্থায় অসন্তুষ্ট মানুষের উপর উৎপীড়ন হয় এবং শৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তিতাকে কঠোর আঁটসাঁট অবস্থার মধ্যে রাখা হয় যে পর্যন্ত ইহা (যাহারা ইহাকে নূন্যতম যোগ্যতার উপায় হিসাবে কল্পনা করিয়াছিল) তাহাদের সময় ও উদ্ভাবনাশক্তিকে অধিকতরভাবে শুষিয়া না ফেলে। বর্তমানে ইহা এক বীভৎস লক্ষ্যে পরিণত হইয়াছে কারণ ইহার বাস্তব রূপায়ন সেই অবস্থাকে বিপন্ন করিয়া গিয়াছে এবং ইহা এমন এক পঙ্কিল আবর্তে পতিত হইয়াছে (যেমন বাঁচিয়া থাকার জন্য অবদমন করিতে হয় এবং অবদমন করিবার জন্য বাঁচিয়া থাকিতে হয়) যেখানে প্রতিশেধকই রোগ অপেক্ষা অধিকতর মর্মান্তিক হইয়াছে। এই প্রতিকার ঐ সব গোঁড়া মতবাদের রূপ গ্রহণ করিয়াছে যাহা ব্যক্তির আচারনিষ্ঠ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীন আত্মপ্রকাশ, মানুষের মধ্যকার অন্তহীন বিভিন্নতা ও তাহাদের সম্বন্ধে অনন্ত পার্থক্য এবং স্বাধীন মনোয়নের অধিকার (যাহা সহ্য করা কঠিন কিন্তু ত্যাগ করা আরও অসহনীয়) বলিতে কি বুঝায়, বা ইহা কি, এই সব ব্যক্তি তাহা জানিত না বা ভুলিয়া গিয়াছিল।

যুক্তিতর্ক অনুসারে এই উভয়সংকটের কোন সমাধান নেই। আমরা স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে পারি না, আবার সমৃদ্ধির নূন্যতম মানদণ্ডকেও বিসর্জন দিতে পারি না, যুক্তিমত অপরিচ্ছন্ন, নমনীয় ও এমনকি সার্থক ও সন্দেহজনক আপোষ রফার মাধ্যমেই এই উভয়সংকট হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক অবস্থার জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে হয় কারণ ইমানুয়েল কাণ্ট একদা বলিয়াছিলেন যে মানবতার বিকৃত কাষ্ঠ হইতে কোন ন্যায্য জিনিষ কখনও হয়

নাই। যুগের দাবী হইতেছে অধিকতর বিশ্বাস নয় বা অধিক শক্তিশালী নেতৃত্ব নয়, বা অধিকতর সুসংগত সংগঠন নয়; পক্ষান্তরে যুগের দাবী হইতেছে এই সবের বিপরীত—প্রত্যাশিত ত্রাণকর্তা সম্পর্কে কম আবেগ অধিকতর মার্জিত সন্দেহবাদ, ব্যক্তিগত মানসিক বিশেষত্বের প্রতি অধিকতর সহনশীলতা, বিশেষ ও ক্ষণস্থায়ী ব্যবস্থা, এবং ব্যক্তি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অধিকতর সুযোগসুবিধা বিধান করা, যদিও তাহাদের রুচি ও বিশ্বাস সংখ্যা-গরিষ্ঠদের রুচি ও বিশ্বাস হইতে বিভিন্ন। যে জিনিষের প্রয়োজন তাহা হইতেছে সাধারণ নীতির — যতই যুক্তিসংগত ও ন্যায্য হউক না কেন — অপেক্ষাকৃত কম স্বাধীনইচ্ছাপূর্ণ ও কম আবেগপূর্ণ প্রয়োগ। ইহা অভ্রান্ত এই কারণে নয় বরং অভ্রান্ত ইহার কঠোর ও খোলাখুলিভাবে উপযোগবাদী কারণে। প্রয়োজনীয় বিবাদ হিসাবে আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট নতি স্বীকার করিব। ভুলের কোন সুনিশ্চিত সমাধান নাই। কোন বিন্যাস বা ব্যবস্থাই চূড়ান্ত নয়। তাই একটুখানি শিথিল ধরণের গঠনরীতি ও একটুখানি অকার্যকরতা বা জগাখিচুড়ি, এমনকি ভুলভ্রান্তি, খানিকটা অর্থহীন কথা, খানিকটা অর্থহীন কৌতুহল, বিনা অনুমতিতে উদ্দেশ্যহীন-ভাবে এই আদর্শ বা সেই আদর্শের অনুসরণ করিলে অধিকতর স্বতঃস্ফূর্ত ব্যক্তিগত পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে। এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন ও অতীব সূক্ষ্মভাবে গঠিত ও আরোপিত নমুনা বা ছাঁচ হইতে অধিকতর মূল্যবান ও অর্থপূর্ণ হইবে। সর্বোপরি ইহা বুঝিতে হইবে যে, যে ধরণের সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করিবার জন্য বিভিন্ন ধরণের শিক্ষাপ্রণালী বা জীবনযাত্রার বৈজ্ঞানিক, বা ধর্মীয়, বা সামাজিক সংগঠনের ব্যবস্থা করা হয়, সেই সকল সমস্যা মানব জীবনের প্রধান বা মূখ্য সমস্যা ও প্রশ্ন নহে। এই সকল সমস্যা মানুষের মৌখিক সমস্যা নয় যাহাতে পরিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তর দেখা যায় এবং তাহাদের সময় সুযোগের সর্বাগ্রে করনীয় কর্মও নয়। এই সকল মৌলিক প্রশ্ন ও সমস্যার প্রতি কোন প্রকার পরিকল্পনা নাই এবং কোন প্রকার প্রয়োগ অনুযায়ী সরঞ্জাম নাই, যাহার সফলতা সম্বন্ধে কোন প্রকার সচেতন আশা নাই, এবং যাহা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে নাই — ইহা হইতে আসে ব্যক্তির ও মানুষের জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময়।